



ଆନାଦେ କୁଣ୍ଡଳ ଫଳିତ

ଶାରଦ ସଂଖ୍ୟା || ୧୪୧୮

For all previous magazines and current magazine please visit

<https://kolom.netlify.app/>

This will help you in seamless viewing of all audio-visual mediums which include songs, videos, short films etc. Also to have full details and records of donation please visit our website.



PRICE: Rs 25.00



AMADER SWADHIN KOLOM



In association with Khorosrota

গত বছরের মতো এবারও পত্রিকা হেতু সংগৃহিত সমস্ত অর্থই তুলে দেওয়া
হবে সমাজ সেবায় নিযুক্ত মানুষরূপী সাক্ষাৎ দেবতাদের হাতে।
এবারের ম্যাগাজিনের জন্যেও ধার্য মূল্য আগের বারের মতোই রাখা হয়েছে
₹২৫। তবে যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান তবে আপনাদের মন
মতো অর্থ ডোনেট করতেই পারেন।। আমাদের স্বাধীন কলম পুজো সংখ্যা
থেকে সংগৃহীত অর্থ এবছর আমরা "শবর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট"-এ প্রদান
করব।



যেখানে সম্পাদকের কোনো কলম নেই...

পথ চলতে চলতে বছর পাঁচেক কেটেছে। ছোট বঙ্গুদ্ধের গভী পেরিয়ে আরো অনেক সঙ্গীদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত পেয়েছে "আমাদের স্বাধীন কলম"। সময়ের সাথে সাথে আরো অনেক নতুন বঙ্গু পাবো, এই আশা নিয়ে একটু একটু করে আমরা এগিয়ে চলেছি ভবিষ্যতের পথে। আমরা যেমন পেয়েছি নতুন নতুন ফুটে ওঠা বেশ কিছু ফুলকে, তেমন গতবছরের মত এবছরেও আমরা পাশে পেয়েছি বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিস্বর্কে। সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ, নিজেদের লেখা কবিতা, গল্প, আঁকা, ফটোগ্রাফি আর আব্রতি-গান-নাচে আমাদের শারদ সংখ্যাকে আরো সাজিয়ে তুলতে, আমাদের মেইল করো, forum.kolom@gmail.com ।।।
লেখা মেইল বডিতে টাইপ করে বা ডকুমেন্ট ফাইলে এবং আঁকা বা ফটোগ্রাফি ডকুমেন্ট ফাইলে পার্থন ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আব্রতি-গান-নাচের অডিও বা ভিডিওর ড্রাইভ লিঙ্ক মেইল করুন ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে। শীঘ্ৰই প্রকাশিত হবে অডিও ভিড্যুয়াল "আমাদের স্বাধীন কলম শারদসংখ্যা ১৪২৮"।

বিশেষ ঘোষণা: গত বছর থেকে পুজো সংখ্যার উপর আমরা ন্যূনতম ২৫ টাকা মূল্য ধার্য করেছিলাম, সংগৃহীত অর্থ কোদালিয়া নেতাজী স্কাউট অ্যান্ড গাইড গ্রন্থকে প্রদান করা হয়েছিল। এবছরেও ধার্যমূল্য ন্যূনতম ২৫ টাকা। আমাদের স্বাধীন কলম পুজো সংখ্যা থেকে সংগৃহীত অর্থ এবছর আমরা "শবর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট"-এ প্রদান করব। তাই আমরা কোনো সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ।

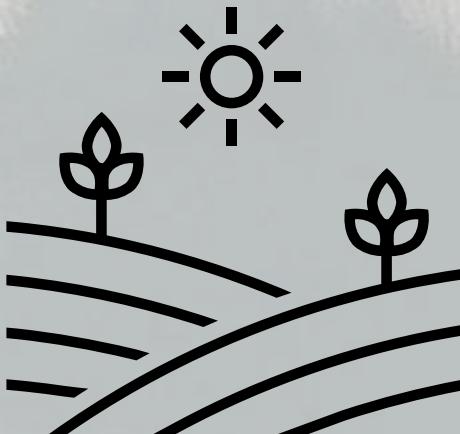


কৃতার্থ পরাজয় দেখতে চাই।।	---	আরণ্যক বসু	6
ক্যামন আছো?	---	মযুখ চৌধুরী	9
পুরাতনী	---	মৌসুমী সেন চক্রবর্তী	12
শূন্যের ভেতর এত	---	দীপ শেখর চক্রবর্তী	13
সমন্বয়ের কবিতাণুচ্ছ	---	সমন্বয়	18
কথোপকথন	---	নন্দিতা সাহা	21
অপেক্ষায় থাকে বুকের বাম	---	সাকিব প্রধান অনিক	23
TAZA KHABAR	---	DIYA MUKHARJEE	25
ম্যাজিক রিয়ালিজম ও মার্কেজ ।	---	জেনিস্তা	27
গতিপথ	---	দেবার্ঘ্য	32
আহ্বান	---	ইমরান আলী	34
TROUBLE	---	IMRAN ALI	37
সাহস	---	হিন্দোল	39
মন বদল ।	---	রীতা ঘোষাল	48
কৃপকথার প্রেম	---	নন্দিতা সাহা	53
রাহু ও শিকারিবা	---	শুভ শেখর হালদার	54
জাফর খাঁ গাজীর মাজার	---	আকাশ মুখাজ্জী	56
আলো-খেলা	----	আকাশদীপ বেরা	73



একুশ দফা	----	জিয়াউল হক	75
বিচ্ছেদ যদি কবিতা হত!	---	সায়ক চক্রবর্তী	77
খোলা চিঠির গল্প	---	সায়ক চক্রবর্তী	78
অপ্রেম	---	সায়ক চক্রবর্তী	79
দাদুর আমগাছ	---	ইন্দ্রানী জানা	80

॥নিরাকার ॥	---	অরিত্ব দত্ত.....	82
॥ ঝণশোধ ॥	---	সৌরভ সরকার	83
॥ হদমাখারে ॥	--	মহুয়া চক্রবর্তী	84
॥ ভূল রাত ॥	---	অরিত্ব দত্ত.....	87
॥ সৃতিসঙ্গ ॥	---	ইমরান আলী	89
চিরকল্প.	---	ইমরান আলী	96
॥ ভিতু এপিটাফ ॥	---	নির্বেদ.....	97
চিরকল্প	---	দেবাঞ্জন ঘোষ.....	115
চিরকল্প.	---	কৃপকল্প ভট্টাচার্য.....	116
সঙ্গীত (AUDIO-VISUAL)	---	সঙ্গিতা মহান্তি.....	117
খরশ্বর্তা (AUDIO-VISUAL).	---	দেবার্ঘ্য, সঙ্গিতা.....	118



(এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই

ভয়জাল,

এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,

মৃত আবর্জনা।

(নৈবেদ্য ৬১/ বিশ্বকবি)

মরণের কাছে ছ-হাত বাড়িয়ে বসেছে অকৃষ্ট জীবন...

#####

শুধু জানতে চায়--আর কী কী আছে তার সন্মোহনের গোপনতম গভের্তে?

আরও কতোটা পাপরঞ্জিত মৃত্যু-উৎসব বাকি?

#####

মানুষের জন্ম যদি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়; তাহলে মর্মান্তিক উন্মত্তার

এমন বেলাগাম স্পর্ধা কেন?

কখনও প্রশামিত, কখনও উজ্জীবিত এই হঠকারী খেলা কেন?

কেন হৃদয়কে বৃন্ত থেকে উপড়ে এনে প্রিয়জনের মৃতদেহ আগলে বসে থাকা

?

প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে,

দমবন্ধ স্তন্ত্র ঘিরে চরাচর নির্লিঙ্গিতা ?

কেন মুক্ত বাতাস থেকে অক্ষিজেন হঠাত নির্বাসনে?

####

কখনও মুখ ফুটে কিসসু না চাওয়া অমৃতস্য পুত্রদের বিষণ্ণ শূন্যতায় এমন
গ্রাউন্ড জিরোর শূশান শূশান শূশান নৃত্য কেন?

#####

হে ঝাতুবৈচিত্রের স্বাভাবিক বিন্যাস,
হে সাগর, পাহাড়, মরু, অরণ্যানির সার্থক সমন্বয়,
হে সঙ্গীত ও আবহ,
হে মরুবিজয়ের কেতন,
হে ঘড়ে উত্তাল আটলান্টিকের কলার-ভেলায় দুঃসাহসী যৌবন ,
হে এলোমেলো ছুলে হালকা রূপোলি রেখার তীব্র আকর্ষণ!
হে চিত্রাঙ্গদার আবিশ্ব-নৃত্যে উচ্ছ্বসিত নারীজন্ম ,
হে অনিবার্য চুম্বনের আগে দু'জোড়া ফুলের থরথর প্রতিক্ষামুহূর্ত...

#####

আমরা এই বল্লাহীন অনাচারের পৃথিবীতে তো, একমুঠো খুউব সাধারণ
বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বাঁচতে এসেছিলাম , তাই না?

###

মরণের পয়েন্ট-র্ল্যান্ক সামনে, দু-হাত বাঢ়িয়ে বসেছে তাই মানবজন্মের
দ্বিধাহীন বাঁচার ইচ্ছেকুঁড়িগুলো...

#####

তারা মানুষের নিশান ওড়ানো জীবনের পায়ের নীচে, মৃত্যুর কৃতার্থ পরাজয়
ও মরণ ঘন্টাগাঁ দেখতে চায়।

লড়াইটা না হয়, নিজের কাছেই থাক,
না হয় শেষটা অন্যভাবেই হলো!
ব্যাক কলারে যেটুকু ঘাম শুকিয়ে গেছে, ব্যর্থতা ওটাই।
তবু এক ফিরতি ট্রেনের সাইরেন রোজ;
চাতালের কুয়াশাকে মিথ্যে করে দিয়ে বলতো,
"ফিরতে হবে! এ নাইলনের দড়ি জড়ানো ঘরটায়।
ফিরতে হবেই!"

তখন যত পিছুটান, হারমোনিক এক আস্ফালন,
অবৈধ সব বাধ্যতা, জড়িয়ে রেখেছে, পুরনো নেশার মতো!
হাত পাল্টায় রেখা ধরে পায়ে, ক্যামন আছো অষ্টাদশী প্রেম?
ক্যামন আছো, নিষিদ্ধ জিজাসা! ভালো?
বলতে হবে এই ট্রাম রাস্তার পাশে, বসে থাকা,
স্বার্থপর শূন্যতার জন্য হলেও... গল্ল গুলো, নিজের মতো।

ডিসেম্বর এলেই, কেউ যেন সরে যায় বছর বছর!
চেনা করিডোরে, কবিমৃত্যু খবরে আসেনা আর;
বছর ঘুরে যায়, বছর মরে যায়, দিনের আলোয়!

কাটাঘুড়ি জুড়ে বসে, অ্যান্টেনা গিলে থায় দ'আনার ঘূম;
শহরতলির কথা কাগজেও ছাপা হয় না, অথবা
হলেও উপেক্ষা মাখানো এক তাচ্ছিল্যে...

কাদা জড়ানো চেক শার্ট পরা ছেলেটা বেলুন হাতে,
কোনো এক কুয়াশার চাদরে মিলিয়ে যেতে যেতে;
বললো, "হ্র এক মুঠো স্বপ্ন দেখি, খালি পেটে"!
বুঝতে পারলাম না, কি বলা উচিত, কতখানি !
সাইরেনের শেষ অক্টেভটা তাড়া করতে করতে,
পেরিয়ে গেছে গন্তব্য স্টেশানের বোর্ড টা।
অশালীন যতো প্ল্যাকার্ড হাতে, ঘোষণা হলো;
"চরিত্রহীনা এক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আলাপ;"

মুহূর্ত এসে কড়া নেড়ে যায়, মুখ পাল্টায় প্রেয়সী!
আমাদের বেঁচে থাকা শুধুই তাৎক্ষণিক...
শোনা যায়, দূরে কোথাও চারপায়ার কলরোল,
দাবদাহ কতখানি নিশ্চুপ হতে পারে, তার কিঞ্চিৎ আঁচ লেগেছিলো !
জানলার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছে পাতা এসেছে বোধ করি,
আমরা তো সরে এসেছি, কতকাল আগেই, মৃতদের দলে
থেকে গেছি তফাতের মতো, উপমার ঝৌঁকে!

হয়তো বা ছাই চাপা, টুকটাক কানাঘুমো চলে—
বেঁচে থাকা এই ভেবে, বলবে কি লোকে।

লড়াইটা না হয়, নিজের কাছেই থাক,

না হয় শেষটা অন্যভাবেই হলো!

"ফিরতে হবে! এ নাইলনের দড়ি জড়ানো ঘরটায়
ফিরতে হবেই।"

॥ পুরাতনী ॥

মৌসুমী সেন চক্রবর্তী

<https://drive.google.com/file/d/1SxHYxW0681Wk2bdxFKGy6ubIZeOsLS9n/view?usp=drivesdk>



বেশ কয়েকবছর আগে একদিন ট্রেনের জানলায় বসে চলেছি। বিপরীতে
ছজন ছেলেমেয়ে। একজনের চোখ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে কোনোও
এক শূন্যতার দিকে। অপরজনের চোখ যেন নিজের ভেতরে ঘুরে ঘুরে অস্থির
হচ্ছে। সেই অস্থিরতার ভেতরে রয়েছে এক অভিমান। বুঝলাম ছজনের মধ্যে
কিছুক্ষণ আগে একটা ঝড় বয়ে গেছে। মেয়েটি ঝড়ের পরে আশ্রয় নিয়েছে
প্রকৃতির শূন্যতার দিকে। এদিকে ছেলেটির আশ্রয় নিজের ভেতরে পাকিয়ে
তোলা এক অন্ত্রুত অভিমান। দন্ত লিখতে গিয়েও হাত আটকে গেলো। দন্ত
নয়, হয়ত অভিমানও নয়। শিশুর ছটফটানি তাও ঠিক বলা যায়না। কিন্তু
মেয়েটির মুখ আশ্চর্য শূন্য। সামান্য অস্থিরতা নেই ভেতরে। বুঝলাম, এই পথ
বেশিদিন চলার নয়। ছেলেটির জন্য এক অন্ত্রুত বেদনা হল অথচ কিছুই তাকে
বলা যাবেনা। আমি যে এই সমাপ্তি বুঝে গেলাম, এই আমার এক অভিজ্ঞতা।
অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে কি ভীষণ অভিশাপ হয়ে ওঠে।

কিছুদিন আগেই শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পড়লাম—
প্রথম আঘাত/তুমি কথা রাখো নি ব'লে/দ্বিতীয় আঘাত/তুমি কথা রাখো নি
ব'লে/তৃতীয় আঘাত/তুমি কথা দিয়েছিলে কেন?/মুর্তি, এবার নিজে-নিজেই
ভেঙে পড়ো/বেদীর চারিদিকে।/দেরি করলে/আমি যে ভেঙে পড়ব।।

ইচ্ছে করেই কবিতাটি এভাবে লিখলাম। দেখুন মনে হচ্ছে একটা রেলগাড়ি
এবং অনেক কামরা। ঠিক ‘মুর্তি’ বলে যে শব্দটি আছে সেটি আমি এবং

তারপর একটি কমা। এই কমা হল সেই মুহূর্তে আমার সামনে উপস্থিত একটি
বিচ্ছেদ দৃশ্য।

কবিতাটি পড়ে আমার সেদিনের ঘটনাটি মনে পড়ে গেলো। আর মনে পড়ে
গেলো আরেকজনের কথা। মার্ক শাগাল। আমার জীবনের সবথেকে বড়
অপ্রাপ্তি যে শাগালের কোনও আসল ছবি আমি আজ অবধি দেখে উঠতে
পারিনি। আমি শুধুমাত্র ছবিতে রঙের ব্যবহারের জন্য শাগালকে আমার
জীবন সমর্পণ করতে পারি। বিশেষত, বেলাকে নিয়ে তার ভালোবাসার রঙ।
এইখানে একটি সামান্য হলেও অসামান্য ভুল কথা বললাম।

বেলাকে নিয়ে শাগালের ভালোবাসার রঙ আমাকে মুক্ত করেনা। আমাকে মুক্ত
করে বেলাকে নিয়ে ভালোবাসার রঙের মধ্যে কীভাবে নিজের বিষণ্ণতাকে
আড়াল করতে পারতেন শাগাল। যদি তথ্যগতভাবে খুব ভুল না করি বেলার
মৃত্যুর পর ন’মাস কিছুই আঁকতে পারেননি শাগাল। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে
তিনটি প্রেমে জড়িয়েছিলেন তিনি।

যাই হোক, আবার কবিতাটিতে ফিরে যাই। প্রথম তিনটি পঙ্ক্তি যার মূল সুর,
কথা না রাখা। তার মাঝে আমি, মূর্তি। তারপর ‘কমা’ নামক একটি যতিচিহ্ন
যা একটি বিচ্ছেদদৃশ্য। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঘাত। শাগালের প্রথম
আঘাত, স্ত্রী বেলার মৃত্যু। দ্বিতীয় আঘাত, যে পরিচারিকার সঙ্গে তিনি
পরবর্তীতে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি তাকে প্রতারিত করেছিলেন। তৃতীয়
আঘাত, শেষতম প্রেম যে আজীবন কথা রেখেছিল।

তাহলে কথা দেওয়ার আঘাতটি কেন?

এবার ঘটনার দ্বিতীয় অংশে আসি। কিছু ব্যক্তিগত কথা এই প্রসঙ্গে না বললে নয়। কিছু কাজের প্রয়োজনে এবং তার থেকেও বেশি অকাজের প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে দীর্ঘদিন ভাড়া আছি। জায়গাটি আমার পূর্বপরিচিত। কিন্তু কখনও এভাবে একা ঘর করে বসা হয়নি। অবসর সময়ে নিজের মতো করে একটু ঘুরতে বেরোই মূল শহর থেকে দূরে। নতুন পথ, নতুন নতুন জায়গার প্রতি আমার এক তীব্র আকর্ষণ আছে।

এমনই এক জায়গায় সন্ধের চারের দোকানে একজনের সঙ্গে আলাপ। আলাপের সুগ্রটা হল ছবি এবং কবিতা। ফরাসি কবিতা যে ইংরেজি কবিতার তুলনায় আমাকে বেশি মুঞ্চ করে এই তথ্য আমাদের কাছাকাছি এনেছিল। আরও কাছে এনেছিল এই তথ্য যে দুজনে মোটামুটি একই কারণে প্রবাসী হয়েছি।

কারণটার খুব সরলীকৃত রূপ এই- নিজেদের সামনে একটি স্বচ্ছ আয়না তুলে ধরতে।

এরপর মাঝে মাঝেই দেখা হয়। আমরা রঙ নিয়ে কথা বলি, কবিতার ভাষা নিয়ে কথা বলি, গোটা পৃথিবীটা কীভাবে ক্রমাগত হারিয়ে দিচ্ছে আমাদের- সেই নিয়েও কথা হয়। তবে কথার থেকেও বেশি হয় না বলা কথা। এই না বলা কথার মধ্যে দুকে যায়, আমাদের না বলা ঠিকানা, না বলা যোগাযোগ নম্বর, না বলা এই সময়ে দেখা করতে আসা। এসবই না বলা কারণ আমাদের দেখা করার আলাদা করে কোনও উদ্দেশ্য ছিলনা। আমাদের দেখা হয়ে যায়।

ঠিক সেই সময়ে আমি একটি ছবি আঁকছিলাম। প্রথম স্তরের রঙ চাপানোর পর, দ্বিতীয় স্তরের রঙ চাপানো হচ্ছে সেই সময়। প্রতিবার দেখা হয় আর নতুন নতুন রঙ আমার ছবিটির ওপরে এসে চাপে। এভাবেই চলছিল। আমাদের দেখা খুব একটা নিয়মিত নয়। তবে যখন হয় মনে হয় যেন একটা নতুন রঙ আমার ছবিটির ওপরে চাপলো।

এবার আবার কবিতাটি দেখুন। এখন ট্রেনের কামরা নয়, কবিতাটি একটি সম্পর্কমালা। যোগাযোগমালা বললেও ভুল হবেনো। আমার অবস্থান বদলায়নি। আমি সেই মূর্তি, সমস্ত ঘটনার এক দর্শকমাত্র। আমার পরে একটি ‘কমা’ নামক যতিচিহ্ন এখনও রয়েছে। এই যতিচিহ্নটি কী? একটি দ্বিধা। দ্বিধার পূর্বে কী রয়েছে?

‘তুমি কথা দিয়েছিলে কেন’

কিন্তু বাস্তবে আমরা কাউকে কিছুই কথা দেইনি। তবে সেই না দেওয়া কথার মধ্যে একটি কথা কেমন দেওয়া হয়ে গেছে। এখন সেই কথাটির কোনও ভবিষ্যৎ নেই। কারণ মাঝে মূর্তি আমি, তারপর একটি কমা নামক যতিচিহ্ন। যা আমার দ্বিধা।

বহুদিন নানারূপ আলাপের পর মনে হল এবার বেদীর ভেঙে পড়া প্রয়োজন নইলে আমারই ভাঙন নিশ্চিত। বিশেষত একজন মানুষের বিষন্নতা যে প্রবল ভাবে আমাকে আকর্ষণ করে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা হবে। এবারের কথা পূর্বের থেকে কিছুটা ভিন্ন হল। বললাম, দেখা

করবেন, এমন সময়ে, এমন দিনে। বুঝলাম তার মুখ আশ্চর্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হয়ত মূর্তির ভেঙে পড়ার অপেক্ষা তারও ছিল।

দিন ঘনিয়ে আসছে এদিকে আমার উভেজনা বেড়ে চলেছে। আমার ছবিটি ও শেষ, ফলে সেটি উপহার দিয়ে নতুন এক সূচনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছি। সঙ্গে এক বাঙালি কবির কবিতার বই, কাগজের খামে জড়িয়ে। নির্দিষ্ট দিন এলো। কোথায় অপেক্ষা সেইসব পথ আমার চেনা। অনায়াসে এমনকি চোখ বুজে আমি চলে যেতে পারি সেই ঠিকানায়।

পারলাম না।

‘তৃতীয় আঘাত/তুমি কথা দিয়েছিলে কেন।’

চলে এলাম আবার নিজের একাকীত্বের কাছে।

আবার কবিতাটির দিকে তাকান। প্রত্যেকটি বিচ্ছেদ লক্ষ্য করুন। দেখুন একটি লম্বা দাগ কেমন বেঁকে গেছে। তফাং করে দিচ্ছে। ট্রেনের মেয়েটির কথা মনে পড়ছিল। যে আবার ফিরে গেছিল প্রকৃতির শূন্যতার কাছে। ছেলেটি যে নিস্ফল অভিমানে নিজের ভেতরে গুমরে গুমরে মরছিল। মনে পড়ছিল শাগালের স্ত্রী বেলার মৃত্যুর পর ন'টি মাস শাগাল কিছুই আঁকতে পারেননি।

সেকি যন্ত্রণায় নাকি বহুবছর পর নিজের মুখেমুখি দাঁড়ানোর তৃপ্তিতে।

শুনেছি অতৃপ্তিই শিল্পীকে সৃষ্টি করে।

সেদিন বাড়ি এসে আবার নতুন করে রঙ চাপিয়েছিলাম ছবিটিকে। কোনও ছবির, কোনও লেখার কখনও মুক্তি নেই। তার ওপরে ক্রমাগত রঙ, শব্দ চড়তেই থাকে।

এতো অপরিচিত

তবলার বোলের মতন অনামী
একটা কাজের জন্যে, প্রতিদিন আমি
বেতন পাই। মাটিতে থাপর মেরে মেরে চলে
চার পাঁচ বছরের হাত ও পা।

জানি এই তার একমাত্র বসতি

চেউ ভাঙে আর
আলো পুড়ে যায়, আলোর ভেতরে...

যার জলের চোখ,
অবশ পাতার মতন চোখ যার –
সেই ভাসমান নির্বোধীকে ঝৰ্ণা করি...

জানি এই তার একমাত্র বসতি

হাতের তালুর মাফিক গোটা শহর
এতো অপরিচিত বন্ধুর মতন যে,
ছায়ার শক্ত অনুবাদ লেলিয়ে দিই,
বলি, “তাকে ছুঁয়ে অদৃশ্য করো এবং
পুনঃ পুনঃ শোকাহত হও দৃশ্যের প্রতি। “

তারা আমারই করতলে ফিরে আসে,
জমে থাকতে থাকতে
জানি এই তাদের একমাত্র বসতি।

কালো জেব্রার ছায়া

১

হংখ বদলের সময় হলে
হংখ, জানি আমার
সন্ধ্যাস নয়, শান্তির প্রতি ঝোঁক
মৃত্যু নয়, মৃতের প্রতি ঈর্ষা

২.

টোটেম মানেই মৃত্যুভাবনা নয়
এই মুহূর্তটা চলমান অনুস্বার
আর নীল রিফিল স্নায়ুতে
ছটো সমান্তরাল বিড়াল জিভ পেতে আছে
জননে কয়েক গজ বিবর্তনী ছায়ার ক্রমশ ইজেল
না, আমরা যোনিমুখে কবিতা করবো না।

-বলো

(ফোনের ওপার থেকে একটু গলাধরা কঢ়ে)

-দেখা করবি, urgent?

-ওকে, টিফিন টাইম এ বেরিয়ে যাচ্ছি।

(ঘড়িতে তখন ১টা, সময়টা দেখে হটাং মাথায় এলো, রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। ব্যাগটা গুছিয়ে বস কে বলে leave নিলাম তখনই, তারপর 45B ধরে সোজা গঙ্গার ঘাট. পৌঁছে দেখলাম সেই কদম গাছের নিচে ভাঙা সিঁড়িটাতে বসে আছে)

-ওইইইই...

(পাশে গিয়ে বসলাম)

-এবারও পারলাম না রে..

(ডানহাতটা কাছে টেনে নিয়ে বললাম)

-নাও, তোমার প্রিয় ফাইভ স্টার.

(চকলেট সমেত আমার হাতটা দুরে সরিয়ে দিলো. চোখ ছলছলে-ভাঙা কঢ়ে বললো)

-তুই বাড়িতে এবার কি বলবি?

-যা হয়েছে, সেটাই বলবো. এতে ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি.

-এরপর কি হবে আমাদের? আমি কি করবো?

-শুধুই পড়াশুনা, PhD টা শেষ করো। আর তার আগে যদি বাইরের আর কোনো চাকরির পরীক্ষা দিয়েছো, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিলাম।

-কিন্তু...!

-আবার কিন্তু, কি বললাম শুনতে পেলে না...

-তুই এভাবে কতদিন চালাবি আর?

-কেন? সব দায়িত্ব কি শুধুই ছেলেদের? আর মেয়েরা কি রূপ আর গুণের ভান্ডার নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে...!

-না এমনটা নয়, তোর তো অনেক উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যত হতে পারতো!

-আমি যেদিন থেকে তোমাকে পেয়েছি, সেইদিন থেকেই আমার bright future শুরু হয়েছে। তুমি বুঝবে না এটা...

-কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত এর কি হবে?

-আমাদের সংসারে অধিকার যখন ছজনের সমান, তেমনি দায়িত্বটাও...

॥ অপেক্ষায় থাকে বুকের বামা। --- সাকিব প্রধান অনিক

আমার ভালোবাসি কথাটি বলার পর্ব শেষে,
জিজ্ঞেস করেছিলাম — "আমায় কি মনে ধরেছো?"
তোমার গালে একধরনের লজ্জা লাল হাসি মেখে,
বলেছিলে — "হ্যা ধরেছি আর বেধেছি মনের সাথে।"

ভালোবাসার অনেকদিন পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম — "আমায় কি তোমার খুব
আপন করেছো?"
তুমি অবাক হয়ে বলেছিলে —
"আমি মানুষের হাতে হাত রেখে নির্ভরতার শরীরটুকু ধরেছি।"

একদিন এমনি কোন ভালোবাসা মন্দবাসার অনুক্ষনে, সারাবেলা কেটে
যাওয়ার পড়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম —
"এই, আমায় কি আজ সারাদিন মনে রেখেছো?"
তুমি আনমনা ব্যস্ত সুরে বললে তখন —
"নাহ! সারাদিন সময় কই এত?
আমি খানিক থমকে তখন, মাথাটাও হলো বিষাদে নত!

তুমি তোমার কথা বলেই চললে —

"ঘর গুছালাম সকালবেলা,
মায়ের ওষুধ দিলাম মাঝহুপুরে;
চায়ের কাপ পাশে রেখে বারান্দাতে বিকেল হলো হেলা,
পাশের বাসার মেয়েটাও—
সন্ধ্যাবেলা হাজির হলো কঠিন গনিতের প্রশ্ন নিয়ে ;
আর রাতের অবসর!
সে তো বাবার ঘরের মশারীটা টানিয়ে দিয়ে।"

আমি এবার থামিয়ে তোমায় বললাম —
"এবার ঘুমাও, তুমি অনেক ক্লান্ত এখন। "

ও পাশের তুমি এ কথাতে গজে উঠে বলতে লাগলে—
"সকাল, ছপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাতের সারাবেলা;
ফোনটা আমার হাতেই ছিল,
বিছানার পাশেই ছিল,
কতবার দেখেছি ভেসেছে কি তোমার নাম!

তখন আর বাকী রইল না বুঝতে প্রিয়,
ভালোবাসি না বলেও ভালোবাসার জন্য অপেক্ষায় থাকে— হাতের পাশের
ফোন আর বুকের পাশের বাম!

Apne sapno ke buniyaad pe ,
Mai aaj teri parchhai dekhta hoon,
Apni khaali jeb mein haath daal ke,
Mai teri kamaayi ka tamaasha dekhta hoon.

Tere waadon mein hai chhupi hui,
Bewaafai ke sau pehlu,
Phir bhi tere kamiyaabi ki shehnai sunta hoon,
Mai ek ek haadsa harjaai,
Sab yaad rakhta hoon.

Tu rehta hai alishaan makaanon mein,
Aur mai kachhe ghar mein rehta hoon,
Chhat se tapakti hui baarish ke paani ko bhi,
Mai sambhal ke rakhta hoon.

Laziz khaana, aish-o-araam, kitna kuch tere paas hai,

Teri farebi khusi kya jaane, kaun udaas hai ?

Mere paas kuchh nahi, sirf ek aas hai,

Usi aas ke khaatir, chalti meri saans hai.

Naa jaane yeh taakat ka kya rog chhayi hai,

Akhbaar laao zara dekhun toh,

Aaj phirse tuu ne apni kaunsi jhoont ki safaa gaayi hai.

॥ ম্যাজিক রিয়ালিজম ও মার্কেজ॥. --- সৌমিত্রা

"আমি সব সময়ই এটা দেখে মজা পাই যে আমার কাজের বড় প্রশংসাগুলো আসে কল্পনার জন্য। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, আমার লেখালেখির মধ্যে একটি লাইনও নেই, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। সমস্যা হচ্ছে, ক্যারিবীয় বাস্তবতার সঙ্গে বাঁধনহারা কল্পনার মিল রয়েছে।" গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ স্বয়ং ম্যাজিক রিয়ালিজম সম্পর্কে এই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ম্যাজিক রিয়েলিজম নিয়ে কথা বলার আগে এ বিষয়ে লেখক নিজে কী ভাবতেন তা জেনে নেয়া যাক। মার্কেজ বলতেন, আমাদের জীবন ম্যাজিক রিয়েলিজমের বাইরের কিছু নয়। আমাদের জীবনেও এমন কিছু ঘটে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, তবে তা অবাস্তব কিছু নয়! আসলে ম্যাজিক রিয়েলিজম অর্থাৎ জাহু বাস্তবতার বিষয়টি এমনই। ছুটি আলাদা সত্ত্বা জাহু এবং বাস্তবতা! জাহুর সঙ্গে বাস্তবতার ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মার্কেজ ছটো বিষয়কে একসাথে করে এমনভাবে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যেন ছটো সত্ত্বা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়! এখানেই আসলে মার্কেজের অনন্যতা! আবার অন্তর্ভুক্ত একটা কিছু লেখা মানেই জাহু-বাস্তবতা নয়, এখানেও আসলে কিছু প্যাটার্ন আছে। জাহু-বাস্তবতার ঘটনা ব্যাখ্যা করা গেলে সেটা আর জাহু-বাস্তবতা থাকে না, তেমনি জাহু-বাস্তবতার কথা শুনে আমাদের মন যদি অবাস্তব বলে নাকচ করে দেয় তখনও সেটা আর জাহু-বাস্তবতা থাকে না! তাই খুব

গভীরভাবে ম্যাজিক রিয়েলিজম নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কেজ বলেছিলেন,

"আপনাকে যদি আমি বলি, আকাশে হাতি উড়ে বেড়াচ্ছে, আপনি কখনোই বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আপনাকে যদি বলি, আজ সকাল ৯টা নাগাদ আকাশে চারটা হাতিকে উড়তে দেখা গেছে, আপনি খানিকটা হলেও এটা বিশ্বাস করার দিকে এগোবেন!"

আসলে ম্যাজিক রিয়েলিজম এভাবেই কাজ করে। আরও একটু বিস্তারিত বললে বলা যায়, ম্যাজিক রিয়েলিজম শুধু একটা ব্যাখ্যাতীত ঘটনার সম্মুখীন করবে না, একেকটা ঘটনার সাথে একেকটা গভীর অনুভবের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেবে।

মূলত মার্কেজের সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়েলিজম খুঁজতে হয় না, বরং এটা তার সাহিত্যের একটা সহজাত অংশই বলা যায়। যেমন ধরা যাক, 'সরলা এরেন্দিরা' গল্পে দেখানো হয় ইউলিসিস কোনো কাচ ছুঁলেই তা অনবরত রং পাল্টাতে থাকে। এখন এটা তো আর সত্য সত্য হওয়া না। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে এত কথা আগেই বলা হয়ে গেছে যে এই গল্পের ইউলিসিস যে প্রেমে পড়েছে এটা বলবার জন্য মার্কেজের নতুন একটি প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছিল। মার্কেজ লেখেন "এরেন্দিরা গল্পে আমি দেখাই যে উলিসেস কোনো কাঁচ ছুলেই তা অনবরত রং পাল্টাতে থাকে। এখন, এটা তো আর সত্য সত্য হয় না। কিন্তু প্রেম সম্পর্কে এতো কথা আগেই বলা হয়ে গেছে যে এই ছেলেটি

প্রেমে পড়েছে এট বলবার জন্য আমাকে নুতন প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করে নিতে
হয়েছিলো।"

প্রেমে পড়া বোঝানোর জন্য আমাদের চিরন্তন ট্রেডিশনাল পদ্ধতি
হলো, পাখির গান, বসন্ত কাল ইত্যাদি প্রসঙ্গের সংযোজন ; এরকম আরও
অনেক প্রসঙ্গ যাকে আমরা ট্রেডিশনাল ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ভাষায় উদ্দীপন
বিভব বলি, যেগুলো দিয়ে মূল বিষয়টিকে আলোকিত করে তোলার চেষ্টা করা
হয়। মার্কেজ বলেন যে প্রেমের কথা বোঝানোর ক্ষেত্রে এমন ট্রেডিশনাল
ইঙ্গিত অনেকবার অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে ফলে তিনি এক নতুন
প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করেন। কাজেই সেই গল্লে মার্কেজ আমাদের দেখান
কাচের রং পাল্টে যাচ্ছে আর এমন বাস্তবভাবে দেখানো হয় যে আমরা ভেবে
নিই, প্রেমে পড়লে এমন হতেই পারে। সম্পর্ক-প্রেম-ভালোবাসা কেমন করে
জীবনকে ওলটপালট করে দেয় এসব কথা আসলে সাহিত্যে অজ্ঞবার বলা
হয়ে গিয়েছে। তাই একে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন মার্কেজ, একেবারে
অন্তর সুন্দরভাবে। তবে একটি স্পষ্ট- বোধ আর অনুভবের সাথে, সেই বোধ
অনুভব হিসেব করলে অন্য লেখকদের মতোই প্রেম-ভালবাসা তার এই
গল্লেও এসেছে, শুধু বলবার ধরনটা ছিল ভিন্ন আর গভীর। মার্কেজের
উপন্যাসের ম্যাজিক রিয়েলিজমের কথা বলে আসলে শেষ করা যাবে না।
গ্যাত্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ম্যাজিক রিয়েলিজমগুলো এমনই এক সৃষ্টি
যেখানে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই, তবে বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না! মনে
হবে, আরে এমন তো হয়, আমাদের জীবনেও তো হয় এমন! বিশ্বাস-অবিশ্বাস,

বাস্তব-অবাস্তব কত উপকরণ তো আমাদের জীবনেই মিশে আছ। দার্শনিক
রোহ জাহুবাস্তবতাকে বলেছেন, এটি-

- ১) পরিমিতিবোধ ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখি; এর ভিশন আবেগহীন,
ভাবালুতামুক্ত;
- ২) শিল্পী দৃষ্টি রাখবেন ছোটখাট গুরুত্বহীন বিষয়ের প্রতি; বিষয়গুলো
অস্বস্তিকর হলেও তা নিঃসঙ্গেচে তুলে ধরবেন;
- ৩) এর কাঠামো হবে স্থির, ঘনবন্ধ, কাঁচে ঘেরা জায়গার মতো; হতে পারে
শ্বাসরুদ্ধকর, গতিময়তার বদলে স্থিতিশীলতাই বেশি কাম্য;
- ৪) চিত্র অঙ্কনপদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ নতুন, আগের কোন ছবি আঁকার ধাঁচের বা
হস্তশিল্পের ছাপ তাতে থাকবেনা;
- ৫) এতে থাকবে বক্ষজগতের সাথে এক নতুন আধ্যাত্মিক সম্পর্ক।

গল্প বলার সময় হঠাৎ ‘সময়’ থমকে দাঁড়াবে, আবার তা চলতে আরম্ভ করবে।
জাহুবাস্তবতার গল্পে সময়কে জলের স্বভাবে পেয়ে বসে। সময় সেখানে
সরলরেখা ধরে প্রবাহিত হয় না। জাহুবাস্তব গল্পের কাহিনী যে কোন বাস্তব
জায়গার পটভূমিতে গড়ে উঠতে পারে। জাহুবাস্তব গল্পের অপরিহার্য উপাদান
হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত বা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। সেটা সময়, স্থান বা চরিত্রের মধ্যে মিশে
থাকতে পারে। জাহুবাস্তব কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো- এতে দৈনন্দিন
ঘটনাবলী এমনভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে অসাধারণ সব ঘটনা ঘটতে
থাকবে। গল্প বলার সময় হঠাৎ ‘সময়’ থমকে দাঁড়াবে, আবার চলতে আরম্ভ
করবে। জাহুবাস্তবতায় গল্প বলার স্বরভঙ্গিটাই সব। এখানে কোন বিশ্ময়সূচক

যতিচ্ছ ব্যবহার করা হয় না। বিষয়টি যখন বড়; তখন তা বলা হয় নিচুস্বরে। আর তুচ্ছ বিষয় হলে তার বর্ণনা হবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে। জাহুবাস্তব গল্পের বহুমাত্রিক জানালায় বাস্তবতার সাথে মিশে থাকা যে রহস্য-কুয়াশায় চরিত্রগুলো মিশে থাকে, সেই জগতের আলাদা শিল্পমাত্রাকে কোনোকিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং ব্যাখ্যার বোধ করি কোনো প্রয়োজনও নেই, কেবলই অভিভূত হওয়া যায়, কেবলই এক অভিনব সৌন্দর্যের খেয়াল ভেসে যাওয়া যায়। এই ধরনের গল্পে চরিত্রে বারবার পিছনে যায় আবার ফিরে আসে এবং তাদের অতীতের স্মৃতিগুলো বর্তমানে এসে ক্রিয়াশীল হয়। সেভাবেই দেখা যায় মৃত ব্যক্তিরাও কীভাবে ক্রিয়াশীল চরিত্রে রূপ নেয় কিংবা বেঁচে থাকা মানুষের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ঘটে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নয়; কিংবা বাস্তবতাকে টেকে রেখে নয় বরং বাস্তবতাকে আরো সূচিভেদ্য করার লক্ষ্য।

আমাদের জীবন আসলে একটা গভীর বিষয়। কখনো কখনো আমরা যতটা গভীর দাবি করি জীবনটা আসলে এর চেয়েও গভীর কিছু! জীবনের গভীরতা ব্যাপকতার কথা শত শত বছর ধরে বলা হয়েছে নানা ভাষায়, নানা ভাবে। এরই এক চমকপ্রদ ভাষা হলো ম্যাজিক রিয়েলিজম, কারণ জীবন তো অন্ত্রিক্ষে বটে, আর সেই জীবন নিয়ে অন্ত্রিক্ষে বলতে গিয়েই ম্যাজিক রিয়েলিজমের সৃষ্টি, যা পূর্ণতা পেয়েছে গ্যাত্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের হাতে! ম্যাজিক রিয়েলিজম ব্যাখ্যাতীত হলেও আসলে শুধু সাহিত্যের অংশ নয়, আমাদের জীবনেরও অংশ।

আমি একটা খাঁচা বানাচ্ছি
তাতে আমি একটা নদী পুষবো;

সে থাকবে, রোজ সকালে গান শোনাবে আমায়,
নীলাভ স্বন্ধে ভাসবে আমার শরীর।
জীবনের সব অভিজ্ঞতা,
তারা একে একে আমায় শিখিয়েছে খাঁচা বানাতে
যে খাঁচায় নদী পোষ মানে...।

যে খাঁচায় সময় জীবনপঞ্জির বেত সারি সারি বাঁধে;
বাঁধের প্রতি কোণা দিয়ে নদী মুখ বার করে
আমায় বুড়িছোঁয়া দেয়, তবু ভেজায় না সর্বাঙ্গ।

আমি বলি তাকে, ‘এ ঘর তোমার, তোমার পোষ মানার সংবিধান’,
সে সংবিধান টুকরোটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে,
কাগজ দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দেয়
খরশ্বেতা ঝর্ণার কোলে।
বলে ‘আমার শ্রেত থামেনা খাঁচার কফিনে,

বাঁচেনা স্বপ্ন, ভেজে না অবয়ব, থামে না সময়।'

অভিজ্ঞতার ভারে আজ পড়ুক ধুলো,

পড়ে থাকুক খাঁচা,

নদী বয়ে যাবে নতুন সকালে

অনিয়মের নতুন এক নদীখাতে।

ওগো আমার জন্মভূমি, মনের ব্যাথায় আকুল তুমি;
 তোমার নীতি লঙ্ঘিত মা, মানব শিক্ষায় ব্যার্থ তুমি।
 সবাই ব্যস্ত জাতি-ভেদাভেদে, আর অন্যায় মিথ্যা জয়ী;
 তোমার কন্যারা ধর্ষিতা মা, তাদেরই রক্তে তুমি রক্তময়ী।

দৈনিক হিসেবে মোদেরই দেশে, শত শত হয় ধর্ষিত
 বলতে গেলেই চরিত্রহীনা, আর এই নামেই তারা বর্ণিত।
 অত্যচারিত হইয়া বালিকা, পায়না তো দেশে ন্যায় বিচার
 দেশবাসী সেথা হয়ে থাকে চুপ, এসব ভাবার কি দরকার ?

ধর্ষিতা হয়ে অত্যাচারিত, থাকে যদি পড়ে হাসপাতালে
 সে বিষয়ে সবাই চুপচাপ, ছন্দ মেলায় আপন তালে।
 মৃত্যুর সাথে লড়াই করে, সে- ই যদি যায় মগে
 তখন ওঠে রব,”Justice for her”, নইলে জায়গা পাবে না স্বর্গে।

ইছরের বিপদে টাটকা বাহিনী, খবর পাওয়া যায় জমিয়ে
 এখন যখন সত্য দরকার, মিডিয়ারা সব ঘুমিয়ে।
 পুলিশেরা ব্যস্ত প্রমান লোপাটে, সত্যকে করে মিথ্যা

আসামীরা সেথা পুরো নির্দোষ, যেন অগ্রিপরিক্ষা দেওয়া সীতা ।

ছ-পায়ে হাটা কতো জানোয়ার, নেই তো কারো বিশ্বাস

ছ মিনিটের সুখের জন্য কেড়ে নিল কতো নিশ্বাস ।

যাদের এতো সুখের আশা আর নঘ চিন্তায় ভরা মন, তাদের বলি শোনো
নিজের মা-বোনের প্রতি তো আছে সম্মান, অন্যের প্রতি নৃশংস হয়ো না যেন

।

ওগো আমার দেশের মানুষ, বাড়িতে বসে কি খাচ্ছেন সুপ?

জিহ্বা কেটেছে তো মনীষা বাল্মীকির, তবে আপনারা কেনো চুপ ?

হিন্দু-মুসলিম, দলিত-ব্রাহ্মণ এসব করেই তো জীবন কাটালেন
এসব ভুলে এখন না হয়, সত্যের পথে একটু দাঢ়ালেন ।

এই যে আমার মা-বোনেরা, আপনারাও তো মেয়ে, মায়ের জাত

আপনারা বোঝেন তাদের কষ্ট, দেবেন তো তাদের যুদ্ধে সাথ!

আপনাদের প্রতি যে সমাজ ভাবনা, আর নেতি-মতামত পায়ে মাড়ান
নিজে জাগুন, অন্যকে জাগান, আর ন্যায়ের জন্য উঠে দাঁড়ান ।

হে আমার দেশের খোকা, ভাবছ কি বসে ছাদের তলে

দেশে বড় অরাজকতা, যাবই যাব বিদেশে চলে ।

ওহে বালক শোনো শোনো, দেশ তো তোমার নিজের স্বদেশ
সরকার যেথা অন্ধ হয়ে, তুমিই ধরো বিদ্রোহীর বেশ ।

ওহে বন্ধু Facebook-বাসী, তোমাদের বলি শোনো শোনো
নানা বিষয় তো পোস্ট করছ, এসব লিখতে ভুলোনা যেন ।
এসব পোস্ট-এ হংখের react, আর পরের পোস্ট-এই হাহা দিচ্ছ
বাস্তবতা কি মনে বাঁধে না, এসব ব্যাপার কি এতই তুচ্ছ ?

এককালে দেশে ধ্বনিত হতো “বলো বীর চির উন্নত মম শির”
তাহারই এখন ভাঙ্গা মেরুদণ্ড, তবে কোথা হতে আসে বীর ?
ধিক শত ধিক মোরে, লজ্জায়, রাগে -হংখে মুখে পায় যে হাসি
ন্যায়ের জন্য লড়াই করো, ওঠো জাগো হে ভারতবাসী!

You have so many trouble in your life
Think on it, you are not a child of five
You truly know that you can overcome
But you are depressed, you are in boredom
You don't want struggle, no any kind of pain
Do you not know there is " no pain no gain"?

'Life', it is a race, a game of sacrifice
The all enjoy their life, who are wise.
Never give up, no any unnecessary rest
your labor and pain will make you the best.
Look at the mirror, ask who is better than the other
Let try to play a game of working together.

Try to find the goal in your life to achieve
Find your dream, with which you like a lonely leave.
Don't afraid of the failure, try to access
Don't you know "failure is the pillar of success"?

As the night becomes darkest, then the dawn is so near

As you face your problems in deep, your solutions is closer.

Can you realize, the collection of the little raindrops make the river flow

A little seed generates a giant tree, a firefly is enough to glow .

If you be alone, think you need not to depend upon anyone

But a wise person knows that there is something to be learned from everyone.

Make the best of every second, every minute, every day

Keep going forward, trouble cannot hold you stay.

ইদানিং প্রায়শই ভাবি, আপনার সঙ্গে আমার কেনো আলাপ হয়েছিল? কেনো আপনি এক হাতে চুড়ি পরেছিলেন, অন্যহাত ছিলো খালি? আর পৃথিবীভর্তি লোক বাদ দিয়ে আমার, কেবল আমার চোখই দেখলো আপনার ওই রূপ, কেনো? আজকাল এসব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আমাকে তাড়া করে। কেনো, এক তপ্ত এপ্রিলের রাতে আমার মনে হয়েছিল বৃষ্টি নামবে, ঝাউগাছ ভিজে যাবে বৃষ্টির জলে। আর এত এত মানুষ থাকতে আপনাকেই আমি বলবো এই কথা। কেনো? কেনোইবা আপনাকে আমি বলবো নদী, আর আপনি আমাকে বলবেন, জানেন আমি ছোটবেলায় অনেক কথা বলতাম। বাবা মা আমার নাম রেখেছিল চড়ুই। কেনো এই কথার উত্তরে আমি বলবো, এখন আপনি এত কম কথা বলেন, আপনার নাম হওয়া উচিত বউ কথা কও। কী দুঃসাহসী ছিলাম তখন আমি! এখন শিউরে উঠি মনে পড়লে। আপনি প্রশ্নয় দিয়েছিলেন আমার সমস্ত সাহস। তাই তো আমি দারুণ সহজে কেঁদেছিলাম সেই রাতে।— আপনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ। বললেন, মায়া বেড়ে যাচ্ছে কবি। এবার আমাকে যেতে হবে। আমি মায়ায় জড়াতে চাই না। আপনি জানেন না বোধহয়, আমার জীবনে প্রেম এসেছিল। এসব মায়ার খেলায় আমি আর নেই। চললাম।

আমায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন। আমি কাঁদলাম, সারারাত
কাঁদলাম। সেই আমার শেষ কান্না। অমন সাবলীল কান্না আর আমি কাঁদিনি
এতবছরে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, আপনি গেলেন না। ফিরে এলেন পরদিন ভোরে। এমন
চমৎকারভাবে ফিরলেন যেনো গতরাতে কিছুই ঘটেনি। আমি কোনো ছঃস্বপ্ন
দেখেছি, আপনি কোথাও যাননি কখনো, আমার সঙ্গেই ছিলেন, আমার
সঙ্গেই আছেন। কেনো এমন মনে হয়েছিল আমার?

আপনার মনে আছে, একটা ছোট্ট গ্রাম্য রাস্তার ছাইপাশে দাঁড়িয়েছিলাম
আমরা ছজন, মুখোমুখি। আপনি নাহয় কোলকাতা দেখেননি, দেখেননি
মানুষ হত্যাকারী রাস্তা। আমি তো দেখেছি, কোলকাতার বড় বড় খুনে
রাস্তাগুলোও একদৌড়ে পেরিয়ে যাই আমি। অথচ সেদিন, সেই পড়ন্ত
বিকেলে একটা রোগাভাঙ্গা রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে কেনো যেতে পারলাম না
আমি? কেনো চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে রইলাম, আমি, আপনি— আমরা ছজন? এত
হুর্বার আমি, মুখের উপর বলেছিলাম, আপনার নাম বউ কথা কও। সেই আমি
কেনো মিহয়ে গেলাম, কেনো চুপসে গেলাম! আমি কি সত্যিই কবি?
মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিল, অথচ আমি তার
বন্দনা করতে পারলাম না!

কী হয়েছিল আমার সেদিন, নিজেও জানি না। গাড়ি থেকে নেমে এক দৌড়ে
ছুটে গেলাম চায়ের দোকানে। দেখি একটা ফুটফুটে মেয়ে চা বানাচ্ছে।
জিঞ্জেস করলাম,

কী নাম তোমার?

মেয়েটি বললো, পূর্ণিমা।

আহা! কী দারুণ দৃশ্য। আমি খুঁজতে এসেছি মহাকাশের উজ্জ্বলতমা নক্ষত্র,
আর সেই যাত্রার শুরুতে আমার সঙ্গে দেখা হলো পূর্ণিমার।

পূর্ণিমা মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল সেদিন, আপনি হয়তো লক্ষ
করেছিলেন কোনো জানলা দিয়ে। কিংবা ছাদে উঠে। যে ছাদে দাঁড়িয়ে
আপনি সন্ধ্যে নামা দেখতেন। সূর্য টেকে যেত পাহাড়ি জঙ্গলের অন্তরালে,
অন্ধকার ঘিরে ধরছে উপত্যকা। আর আপনি খোলা চুলে দাঁড়িয়ে আছেন
ছাদে। এমন দৃশ্য যে কতবার আমি কল্পনা করেছি তার হিসেব নেই। আমি কী
ভাবতাম জানেন? অমন সন্ধ্যায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে। আর আমি
বাজারের ব্যাগ হাতে দরজার সামনে দাঁড়ানো, চোখাচুখি হয়েছে দুজনার।
আপনি মৃদু হাসছেন, আমি বলছি,

হাসছো কেনো?

আপনি বলছেন,

কালিকচু পেলে? চিংড়ি? এনেছো তো?

আমি কাচুমাচু ঘাড় নাড়লাম,

না। পেলাম না। তবে আম পেয়েছি, কাঁচামিঠে আম। টক আমও পেয়েছি।

আপনি আবার হাসলেন, বললেন,

তা ঘরে ঢুকবে না? নাকি? ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি দরজা খুললাম, ঘর ভর্তি সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার।

কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই বাড়িতে কে কে থাকে তুমি জানো?

পূর্ণিমা বললো, জানি। মা বাবা আর ছই মেয়ে। বড় মেয়ে বিএড করছে আর ছোট মেয়ে কলেজে পড়ে।

তুমি চেনো ওদের রুজনকে?

মনে মনে বললাম, বড় মেয়েকে না চিনলেও ক্ষতি নেই, ছোট মেয়েকে চেনো? সে আসে তোমার দোকানে? কখনো চা খেয়েছে? কোন কাপে খেয়েছে চা? ওই কাপটা আমায় দেবে? আমি নিয়ে যাবো। নিয়ে যেতে চাই।
পূর্ণিমা বললো, চিনি মানে, শুধু নামে চিনি। তোমরা কী ওদের বাড়িতে এসেছো?

আমি হাসলাম, আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি গেছিল, সেও হাসলো, না না। বললো,
আমরা এসেছি একটা সার্ভে করতে।

মিথ্যে কথা। চূড়ান্ত মিথ্যে কথা। তবুও আমি সায় দিলাম। হ্যাঁ। সার্ভে করতে।
কিন্তু কী সার্ভে, জানি না।

বন্ধুটি কবিতা লেখে, ভবিষ্যতে নামকরা কবি হবে, আমি জানি। আমার দ্বারা
কবিতা লেখা হবে না, তাও আমি জানি। কবিতা লিখতে আমার সঙ্গ লাগে।
আপনি যতদিন ছিলেন কত কবিতা লিখেছি তখন। সেই যে আপনি চলে
গেলেন, আর কবিতা লেখা হলো না। আপনার মধ্যেই আমি কবিতা
দেখেছিলাম। আপনার একটা প্রজাপতি ছবি অঁকা টিশার্ট ছিলো, আর ছিলো
একটা ফ্রেমের চশমা। পূর্ণিমাকে এসব বলা যাবে না।

আমরা কী সার্ভে করতে এসেছি জানি না। বন্ধুটি অভয় দিলো, কিছু একটা
বলে দেব। চল তো তুই।

চললাম ছজন, আপনার বাবার ওষুধের দোকানে।

যে দোকানে একটু আগে বসেছিলেন আপনি, আমি টোটো থেকে নামতেই
চোখাচুখি হলো, তারপরই ভয়াবহ ব্যন্তিয়া ঘরে ঢুকে গেলেন। দোকানের
পিছনেই ঘর। সামনে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তার পিছনে পাহাড়ি গাছের জঙ্গল।
যে জঙ্গলে রোজ সূর্যাস্ত ঘায়।

দোকানে একটা ছোকরা বসা, বাবার সহকারী হবে হয়তো। গিয়ে পরিচয়
দিলাম ছজন।

সার্ভে করতে এসেছি। বন্ধুটি বললো, আমরা ভাষা নিয়ে সার্ভে করছি, এই
অঞ্চলের ভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে।

ছেলেটি কী বুঝলো কে জানে, একটু ভেবে বললো, স্যার তো এখন নেই
দোকানে। আপনারা পরে আসুন।

অগত্যা। আমরা বেরিয়ে এলাম। আবার বসলাম পূর্ণিমার দোকানে। চা দিলো
পূর্ণিমা। গল্ল শুরু করলাম ওর সঙ্গে,
পূর্ণিমা বললো, সামনের বছর ওর বিয়ে। একটা ছোট ভাই আছে ওর, ও বিয়ে
না করলে বাবা ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ চালাতে পারবে না। আপনি তো
জানেন পূর্ণিমাকে, ও কতটুকু মেয়ে তাও আপনি জানেন। ক্লাস নাইনে পড়ে।
সেই মেয়ে এখন আমাদের সংসার চেনাচ্ছে। আর আমরা পিতৃমাতৃঅন্ন

ধৰংসকাৱী ইই তরুণ কবি ওৱ কথায় চিনছি জগৎসংসার। আপনি সবই
জানেন, নিশ্চয়ই কোনো জানলা দিয়ে দেখছিলেন এইসব।

সেই পূৰ্ণিমাৱ বিয়ে হয়ে গিয়েছে কিনা খুব জানতে ইচ্ছে কৱছে ইদানিং।
মনে আছে, আপনি আমায় একটা দীঘিৰ কথা বলেছিলেন, সাগৰদীঘি। দীঘি,
যার নাম সাগৰ— নামগুলোও কী চমৎকার হয়! আমি আপনার নাম
ৱেখেছিলাম নদী। তখন কি জানতাম, নদীৰ শ্রোতেই ভেঙে যাবে আমাৰ
সমস্ত গাছপালা। আমি অথৰ্বেৰ মতো ফিৱে আসবো সমতলে। খৰ পাহাড়িয়া
নদী, নমনীয়তা যার ছন্দে নেই, যে স্বৱৃত্ত, ছুটে চলে। অক্ষৱৃত্তেৰ গান্তীৰ্ঘ
তাৰ মধ্যে নেই। থাকতে পাৱে না। কিন্তু আপনি তেমনটি ছিলেন না, আপনি
অন্তঃসলীলা, যেমন উচ্ছল তেমন গন্তীৱা। সমস্ত ছন্দেৰ উৎস। সহজেই খেই
হারালো তরুণ কবি। লিখলো,

'আমাৰ বেদনাৰ শ্রোত পৰ্ণমোচি,

কান্নাৰা দায়হীন

যে কথা বাকি ছিলো বলা

তা আৱ বলা হলো না'

কেনো এমন লিখেছিল এই তরুণ কবি, আজ আমি জানি না। ভুলে গেছি। এখন
আমি আৱ কবি নই, আগে কবিতাৰ খেলা বুৰুতাম, এখন জড়কাঠেৰ মতো
তাকিয়ে থাকি কেবল। তাকিয়ে আপনার কথা ভাবি। আপনার হোস্টেলেৰ
কথা ভাবি।

মনে আছে, আপনি হোস্টেলে থাকতেন? যে হোস্টেলের সামনে একটা কুয়াশাবিধুর রাস্তা আছে। রাতে আপনি এসে দাঁড়াতেন হোস্টেলের বারান্দায়। আর আমি ঐ রাস্তায়। হোস্টেল ঘেরা অঙ্ককার। আপনি মোবাইলের মৃছ আলো জ্বালিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতেন। আমি মোবাইলের ওই সামান্য ফুটকি আলোয়, দেখতে পেতাম আপনার সম্পূর্ণ অবয়ব। গোলাপি একটা টিশার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি, শাদা একটা সালোয়ার পরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি, কালো ফ্রেমের একটা চশমা পরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। প্রতীক্ষাময়ী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি।

হোস্টেল আর রাস্তার মাঝে ছিলো একটা মাজাপুকুর। কতবার ভেবেছি, ওই পুকুর ভরিয়ে ফেলি মাটি দিয়ে। সোজা গিয়ে দাঁড়াই বারান্দার উপকঢ়ে। অথচ আপনি জানেন না, মাজপুকুর আর নেই। সারাদিন পর কলেজ থেকে ফিরে আর তাকানোর সময় পাননি মাজাপুকুরের দিকে। অভ্যাসমতো মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছেন কখন রাস্তার উপরে ল্যাম্পপোস্টের নীচে এসে দাঁড়াবেন আপনার প্রিয় কবি। কিন্তু কই, কেউ তো দাঁড়াচ্ছে না! উৎকঢ়া বাড়ছে আপনার। ঠিক তখনই, বারান্দার সামনের নিচু মাটি থেকে উঠে এলো একটা কঠস্বর। আপনার পরিচিত ডাক। সে ডাক আমার, আমিই ডাকছি আপনার নাম ধরে...

ফুটসিলিং থেকে ফিরছি সেবার, আমরা ছই বন্ধু। মহুয়ায় থামলো আমাদের গাড়ি। এই কদিনে আপনি বহুবার শাসিয়েছেন আমায়, ফিরে যেতে বলেছেন সমতলে। বলেছেন, আর যেনো না আসি। প্রশ্ন ছুড়েছেন, কোন অধিকারে

আমি পাহাড়ে এসেছি? সত্যিই তো, কোন অধিকারে গেছিলাম সেবার?
ভালোবাসার অধিকার? নাহ। এই নাটকীয় যুক্তি আপনার সম্মুখে খাটে না।
মহৱায় নেমে সিগারেট ধরালাম। ভুটানে সিগারেট খাওয়া শাস্তিযোগ্য
অপরাধ। সারাদিনে সিগারেট খাওয়া হয়নি। তাই ছই বন্ধু আয়েশ করে ছটো
সিগারেট জ্বালালাম। চোখের সামনে খরশ্বোতা তোর্সা। বামপাশে ডুয়ার্স,
ডানপাশে ভুটান। কয়েক পা নেমে গেলাম ওই স্রোতে। তালুতে তুলে একটু
জল মুখে দিলাম। হিমকুচি ছড়িয়ে রাখা জল। ইলেক্ট্রনীয় বেগে বরে চলা জল।
বন্ধুটি আমার ছবি তুলছে পাড়ে দাঁড়িয়ে। শুধু আমার নয়, আশেপাশের
বিভিন্ন দৃশ্য ধরে রাখছে ক্যামেরায়।

আমি তখন কী করছিলাম জানেন? ওই তুষারম্বাতা জলে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম
আপনার কথা। আপনার মুখ ভাসছে জলে। আমি ভাবছি, এই বুঝি আপনি
দ্রুতপারে হেঁটে এলেন, পাড়ে এসে জবাঁঝালো গলায় আমায় বললেন,
উঠে আসুন। এক্ষুণি উঠে আসুন।

আমি ঘাড় ফেরালাম, বললাম,
ভেসে যাবো না। ভয় নেই। যে একবার ভেসে গেছে, সে আর ভাসবে কেমনে?
আপনি আমার কথার রেয়াত করলেন না,
উঠে আসুন বলছি।

উঠে এলাম আমি। এসে দাঁড়ালাম আপনার সামনে।

উৎকর্থার ছাপ আপনার মুখ থেকে তখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।
আমি হাসছি, কী হলো?

আপনি চোখ পাকিয়ে বললেন, খুব শখ সাহস দেখানোর, না? পৌরুষ জাহির
করতে চান?

আমি অবাক, পৌরুষ কোথা দিয়ে এলো? বললাম, না না।

তাহলে নেমেছিলেন কেনো শ্রোতে?

এমনিই। ভুল হয়েছে। আর নামবো না।

আপনি তখনো শান্ত হতে পারেননি পুরোপুরি। অন্তঃসলীলা নদী!— যতটুকু
প্রকাশ তারচেয়ে অপ্রকাশিতই বেশি।

সেদিন আপনাকে শান্ত করতে কতকিছুই না করতে হয়েছিল আমাকে।
কবিতা শোনালেই শান্ত হবেন এমন নারী আপনি নন। সে কি আর আমি
জানতাম না? জড়িয়ে ধরলাম আপনাকে, তখনো মৃছ কাঁপছে আপনার শরীর।
নিঃশ্বাস ঘন, বুকজোড়া স্তন্ত্রিত। আমি সব টের পাচ্ছিলাম, সব।

সন্ত্রে হয়ে আসছিল, ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছিল দিগন্তের আলো। আমরা
পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি মহঘার বেলেমাটিতে। আপনি চোখে চোখ
রাখলেন আমার, ঠোঁট এগিয়ে এলো ঠোঁটের দিকে। তারপর? তারপর কয়েক
মুহূর্ত সব চুপচাপ। সমগ্র পৃথিবী নিষ্ক্রিয়। নৈসর্গিক নিষ্ক্রিয়তা। সময় হারিয়ে
গেলো ওই নৈঃশব্দের আভায়। কতক্ষণ এভাবে কাটলো জানি না। শুধু জানি,
একসময় আপনি আমার কানের কাছে মুখ এনে মেছুর কঢ়ে বললেন,
আমি থাকতে অন্য নদীর জল তুমি ঠোঁটে ছেঁয়ানোর সাহস পাও কোথা
থেকে?

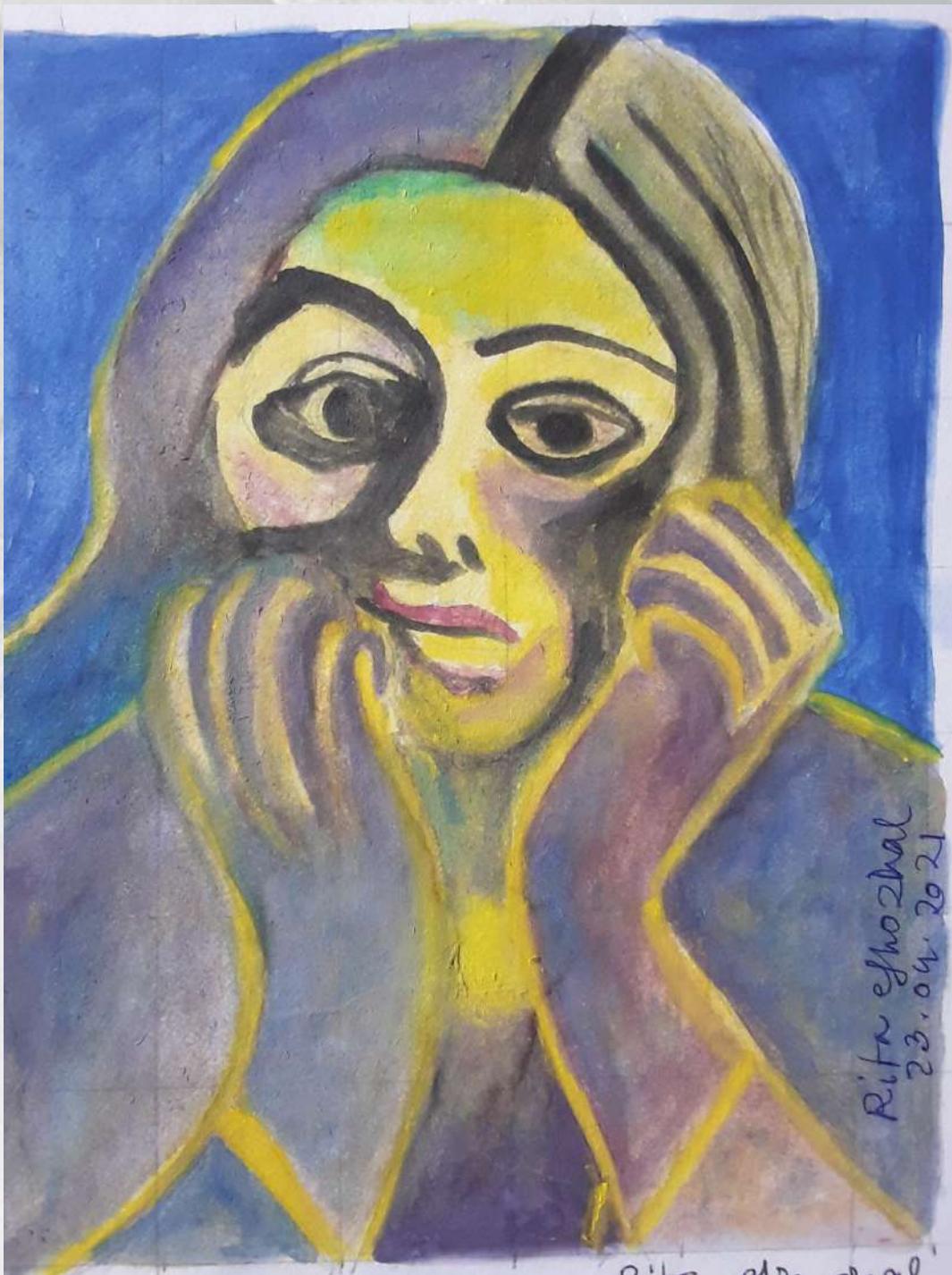
সকালবেলা কয়েকপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। রাস্তাটার জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। ধরা হাওয়াই চটি পরে টিউশনে যাচ্ছে। ক্লাস ফাইভের বাচ্চা। মা চাকরি করেন, পড়ানোর সময় হয় না। প্রতিদিনই সকাল আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছুতে হয়। মিনিট পনেরোর রাস্তা। আজ দেরী হচ্ছে কারণ রাস্তাটা কর্দমাক্ত। চটির বেল্টটা বারবার খুলে যাচ্ছে। এই লকডাউনের বাজারে টিউশনটা থাকেকিনা - ধরা খুব দুশ্চিন্তায় আছে।

আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়ানো। খুবই বাধ্য ছেলে, লেখাপড়ায়ও খুব ভালো। পড়াতে কোনো অসুবিধা হয়না। টিউশন সেরে ধরা গেল গুষ্ঠের দোকানে। মায়ের গুষ্ঠ কিনতে হবে। হ'বছর হলো বাবা মারা গেছেন। হঠাৎ করে বাবার মৃত্যুটা মা মেনে নিতে পারেননি। ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছোট ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। ধরা টাকার অভাবে M.Sc. পড়তে পারেনি। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের পুরো দায়িত্ব ওর উপর পড়লো। ভাবতে ভাবতেই গুষ্ঠের দোকানে পৌঁছে গেল। মায়ের গুষ্ঠ কেনার পর কয়েক প্যাকেট ছাতু কিনলো। সকালবেলাটা ছাতু দিয়েই চালিয়ে দেয়। হপুরের রান্নাটা মায়ের হাতে, ডাল-ভাতের সঙ্গে কোনোএকটা সবজি দিয়ে চলে যায়। বাবা খুব সংসারী ও বাস্তববাদী ছিলেন। অল্ল আয়েও একটু হলেও জমানোর চেষ্টা করতেন। কিছু মান্ডলি স্কিম করে রেখে গেছেন। তাতেই কোনোরকমে

সংসার চলছে। মায়ের গৃষ্ঠ ও ভাইয়ের পড়াশুনা ওর টিউশনের পয়সায় চলে।

পরদিন মাস পয়লা। মাসের প্রথমেই গুঁরা মাইনে দিয়ে দেন। বাচ্চাকে পড়িয়ে ওঠার সময় ভদ্রমহিলা মাইনে দিয়ে বললেন - "আপনাকে কাল থেকে আর আসতে হবেনা। কারণ, প্রাইভেট অফিসের চাকরি বুজতেই পারছেন। কাল থেকে আমার চাকরিটা আর নেই।" কথাটা শুনে ধরার মাথায় যেন বজ্জ্বাত হলো। কিংকর্তব্যবিমুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবশ্য মুহূর্তেই আবার ঠিক হয়ে গেল। বেরিয়ে এল ওই বাড়ি থেকে। রাস্তার কলে অনবরত জল পড়ছে। চোখে- মুখে ভালো করে জল দিয়ে সে আবার হাঁটতে শুরু করলো। কিন্তু মাথায় কেবল একটা কথাই ঘুরপাক থাচ্ছে। মায়ের হার্ট -এর অসুখ - কি করে চলবে গৃষ্ঠ ছাড়া। ভেবে ছিল ভাইকে ইংরেজি ও অংকের জন্য টিচার দেবে। ভদ্রমহিলা এই টিউশনে ভালোই পয়সা দিতেন। নিজের কোনো হাত খরচ ছিলনা। মা আর ভাইয়ের জন্য এই টাকাটা খরচ করতো। এখন কি করবে - ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছেনা। খুব অসহায় লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে গৃষ্ঠের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষন ভাবলো এবং ওর মনে হলো আশা-আকাঙ্ক্ষার চাদরটা যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। সামনে গভীর অঙ্ককার। এই এলোমেলো ভাবনাকে সঙ্গে নিয়েই ও গৃষ্ঠের দোকানে প্রবেশ করলো। অনেকগুলো ঘুমের গৃষ্ঠ কিনলো। অনেক দিনের পরিচিত দোকান। ভদ্রলোক বললেন - এত গৃষ্ঠ দিয়ে কি করবে ? কাকু, চিন্তা-

ভাবনায় মারু রাতে ঘুম আসেনা, তাই নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া সবসময় হাতে
পয়সা থাকেনা। আপনি তো সবই জানেন। তাছাড়া জিনিস-পত্রের দাম
অসম্ভব বেড়ে গেছে তাল সামলাতে পারছিনা।



ধরা দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলোমেলো ভাবে হাঁটতে লাগলো।
মনস্ত করেছে সবাই মিলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরে যাবে। তাই ঘুমের
ওষুধগুলো কিনলো। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় এক বুড়িমা এসে হাত পাতলো
- কিছু দিবিরে মা, দুদিন ধরে খেতে পায়নি। দেখে কষ্ট হলো, একদম নিজের
মায়ের মতো। ব্যাগের একটা কোনায় ছুটো টাকা পরে ছিল - সেটা বের করে
বুড়ির হাতে দিলো। বুড়িমার মুখে হাসি দেখে বড় ভালো লাগলো। বুড়িমাও
তো বেঁচে আছে নিজের মতো করে চেয়ে-চিন্তে। ধরা নিজের কথা ভুলেই
গেল। আনমনা হয়ে যাচ্ছিলো, একটু যাওয়ার পর একটি মেয়ে এসে ওকে
চেপে ধরলো - দিদি আমাকে বাঁচাও, কতগুলো বাজে লোক আমার পিছনে
লেগেছে। মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য মুহূর্তে ওকে পিছনে সরিয়ে নিজে
লোকগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। রাস্তা শুনশান কোনো লোকজন নেই।
লোকগুলো এসে বললো - মেয়েটিকে ছেড়ে দিন। ধরা বললো - আমাকে
মেরে ওকে নিন। ওদের ভয় দেখানোর জন্য বললো - আমি থানায় ফোন
করছি। লোকগুলো ভয় পেয়ে চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর মেয়েটি
ওকে বললো, দিদি কি বিপদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছো। ধরা প্রশ্ন
করলো - তুমি কোথায় থাকো ? মেয়েটি বললো "কাছাকাছি একটা বাড়িতে
রান্না করি। এই পথেই বাড়ি যাচ্ছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম।
তুমি না থাকলে ওরা আমাকে তুলে নিয়ে চলে যেত। আমার ছেলে-মেয়ে
ছুটো অনাথ হয়ে যেত। কয়েক বছর হলো ওদের বাবা নির্খোঁজ। বাড়ি বাড়ি

রান্না করে কোনোরকমে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।" ধরার খুব ভালো লাগলো। একটি মেয়েকে সে বাঁচিয়েছে বিপদের হাত থেকে, আর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। ওর মনের হতাশ ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। মনের ভিতর একটা আনন্দের অনুভূতি তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। রাস্তার পাশে একটা গাছের ডালে একটা চড়াই ওর বাচ্চাকে মুখে মুখ দিয়ে খাওয়াচ্ছে। ধরা দেখছে আর ভাবছে - পাখি সেও তো কত লড়াই করছে তার এই ছোট্ট জীবনে। ঝড়-বৃষ্টি আর প্রকৃতির নানান রোষকে উপেক্ষা করে ওরা বেঁচে থাকে। বাঁচার লড়াইয়ে ওদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়। এই ভেবে ব্যাগ থেকে ঘুমের ওষুধগুলো বের করে বাড়ির কাছেই পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

সকলকে দিয়ে ফাঁকি
লাল নিশান উড়িয়ে বাঁচি।
ডাইরির পাতায় পাতায়
গল্ল গড়িয়েছে রূপকথায়।
আমার শেষ গল্লটা তোমার অপেক্ষায়
আনমনে ভাবনায় রামধনু রঙ পায়।
কতদিন ভালোবাসা থাকবে আড়ালে
বাঁধনহারা হবেই তুমি হাত বাড়ালে।
উগ্রের আশা যে করে না কো-
ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় সে প্রতিনিয়ত।
সাদা কাগজে চিঠি লেখা
তোমার ভালোবাসায় আমার বেঁচে থাকা।।

সমাজের অলিতে গলিতে লুকিয়ে থাকা কিছু কুকুর বেরিয়ে আসে মাঝে
মাঝে,

ছিড়ে খায় মাংস, নরম ঘোবনের মাংস।

বিকৃত মন্তিক্ষের সমাজ আর তার

বিকৃত শেয়াল কুকুরের দল বেরোয় সময়ে সময়ে,

লালিমাময় পূর্ণিমার চাঁদে

গ্রহণের ছোবল দিতে বেরোয় রাত্রি,

আর ভদ্রতার মুখোশে বেরোয় এই সব শিয়ালেরা।

বেরোয় শিকারের লোভে,

নারী রূপী চাঁদের দেহ কে নষ্ট করতে

সদ্যোজাত, ঘোবন প্রাপ্ত নরম মাংসকে ছিড়ে খেতে।

রাস্তার কুকুরেরা মারা পড়ে,

বেঁচে থাকে ভদ্রতার মুখোশে লুকানো

সেই সব শিয়ালেরা।

বিকৃত সমাজ বন্ধ রাখে চোখ

নিঃশেষ হয়ে যায় একটার পর একটা সুন্দর পূর্ণিমা, শেষ হয়ে যায় সয়ত্রে

আগলে রাখা প্রাণ ঘোবন।

সমাজ বন্ধ থাকে সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় পাতায়

আর ধুলোর পরতে পরতে বাড়তে থাকে

শিয়াল-কুকুরের দল।

তারা খোঁজে নরম মাংসের শিকার,

বিকৃত সমাজ চোখে কালো কাপড়ের তলা দিয়ে

শুধু উপভোগ করে,

তকমা লাগায় ঘোর কালো গ্রহণের,

তকমা লাগায় "তুমি নষ্টা তুমি ধর্ষিতা"।।

॥ জাফর খাঁ গাজীর মাজার ॥ --- আকাশ মুখাজী

ভূমিকা:

মসজিদ হল মুসলমানদের উপাসনাগৃহ, ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লার স্মরণ, প্রার্থনা, ও আল্লার কাছে আত্মসমর্পন করে থাকেন যেখানে সিরাত বা নামাজ পড়ার মাধ্যমে। মসজিদ কথাটি মূলত কোরানে ব্যবহার করা হয়েছে, মক্কার মসজিদ-উল-হারাম কে বোঝাতে। এই মসজিদ-উল-হারামের মধ্যেই রয়েছে ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রধান স্মারক, কাবা শরীফ। বলা হয়, এটি তৈরি করেছিলেন প্রথম মানব তথা প্রথম নবী বাবা আদম। ইসলাম মতে পৃথিবীর পবিত্রতম মসজিদ হল এটিই। হজরত মহম্মদ প্রথম মসজিদ তৈরি করেন মদিনায়। যদিও তাঁর প্রচলিত ধর্ম মতে মসজিদ কোনো মৌলিক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান নয়, ধর্মাচরণের জন্য, যেহেতু ইসলাম মতে বিশ্বের প্রতিটি জায়গাতেই আল্লার অমোঘ উপস্থিতি, সেহেতু যেকোনো জায়গাতেই নামাজ পড়া সন্তুষ্ট। যাই হোক, মদিনায় এহেন মসজিদ স্থাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে যত ইসলাম ধর্ম ছড়াতে থাকে ততই ছোট বড় নানা মসজিদ তৈরি করা হতে থাকে। আমাদের দেশ ভারত তথা বাংলাতেও ইসলাম প্রবেশের পরে বিভিন্ন প্রকার ও আকারের মসজিদ তৈরি হয়েছে। হগলী জেলার গ্রিবেনীতে অবস্থিত জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ তথা মাজারটি শুধু বাংলা নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে স্থাপিত প্রথম মসজিদ।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলাম প্রবেশের পর বিভিন্ন মসজিদের পাশাপাশি দরগা বা মাজারের উপস্থিতি ও প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই মাজার বা দরগা হল সুফি পীর দরবেশের সমাধিস্থল। সুফি সিলসিলাগুলির প্রভাবেই মাজারের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ বাড়ে। এই মাজারগুলিকে ঘিরেই মূলত এদেশে বিভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সামাজিক সম্পর্ক, সম্মান, মর্যাদা, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি লোকজ স্তরে আবর্তিত হয়। শরিয়তি ইসলাম অনুসারে মসজিদ মান্যতা পেলেও, মাজার একেবারেই শরিয়ত বিরোধী একটি ভাবনা ও সংস্কৃতি। বাংলার ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে মসজিদের তুলনায় মাজারকেই বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। এমনকি বাংলার বহু জায়গায় পাশাপাশি মসজিদ ও মাজার তৈরি হয়েছে।

ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ত্রে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করার পর মূলত যে কারণে সবচেয়ে বেশি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সংঘাত দেখা দিয়েছিল তার কারণ অবশ্যই এই দুই ধর্মের দর্শন ও আচারগত পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণেই কার্যত এই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একে অপরের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে প্রচুর ভুল ও স্থূল ধারণা আছে। এই সমস্ত ধারণার কারণে হিন্দু - মুসলিম উভয়ের মধ্যেই বিদ্রোহ ভাব পোষিত আছে।

ভৌগোলিক অবস্থান;

জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ ও দরগা (মাজার) বাংলার অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। এটি বর্তমানে হগলী জেলার গ্রিবেনী শহরে অবস্থিত। গ্রিবেনী

বহুদিনের সুপরিচিত প্রাচীন শহর। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। ভাগীরথীর তিন বেনী অর্থাৎ মূল ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী - এখান থেকেই নাকি বিভক্ত হয়েছিল বলে কথিত এবং এই কারণেই ত্রিবেনীকে মুক্ত বেনী বলা হয়ে থাকে। মূল ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত জাফর খাঁ গাজির এই মসজিদ ও মাজার। এটি $২২^{\circ}৫৮'৪৬''$ উত্তর অক্ষাংশে এবং $৮৮^{\circ}২৪'০৩''$ দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের আওতায় এই পুরাকীর্তিটি বর্তমানে আছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সৌধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল।

এইখানে যেতে গেলে হাওড়া-কাটোয়া লাইনের বাঁশবেড়িয়া বা ত্রিবেনী রেলস্টেশনে নামতে হয়। অটো, টোটো বা রিক্সার মাধ্যমে এখানে যাওয়ার উপায় আছে। হাওড়া - বর্ধমান লাইনের চুঁচুড়া বা ব্যান্ডেল স্টেশনে নেমে সেখান থেকে যাওয়া যেতে পারে বাস যোগে।

ঐতিহাসিক পরিচয়:

আজ থেকে ৭২১ বছর আগে ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হগলী জেলার ত্রিবেনীতে তৈরি হয় বাংলা তথা পূর্ব ভারতের প্রথম মসজিদ। এটি প্রতিষ্ঠা করেন সপ্তগ্রামের তৎকালীন শাসনকর্তা জাফর খাঁ গাজি। এই মসজিদের পাশেই ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাফর খাঁ গাজির মৃত্যুর পর তার কবরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় মাজার বা দরগা। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় বহু হিন্দু দেবদেবী ও সংস্কৃতে

লেখা একটি উল্লেখ করে বসানো শিলালিপি। এর পিছনে লুকিয়ে আছে
বাংলার সেই সময়ের এক বৈচিত্রপূর্ণ ইতিহাস।

গ্রিবেনী দীর্ঘদিন ধরেই এক উল্লেখযোগ্য জনপদ। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার
দিকে বাংলার বহু অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে এলেও গ্রিবেনী
তখনও হিন্দু সামন্ত রাজাদের অধীনে। বিশিষ্ট গবেষক আনন্দ ভট্টাচার্য তাঁর
'বাংলার সুফী আন্দোলন' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "এই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জাফর খানকে পাঠায় জাফর খান যুদ্ধ করে
গাজির মর্যাদা পেলেও হিন্দু রাজা কোনোভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে
পারেন।" এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারার সুযোগে জাফর খানকে গ্রিবেনী
সংলগ্ন এলাকার হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।
গ্রিতিহাসিকদের মতে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই মসজিদ ও মাজার
ছইছই তৈরি হয়েছে। বিশেষত, মাজারটি মন্দিরের যে ভিত তার উপরেই
নির্মিত হয়েছে।

আবার পরবর্তী সময়ে এহেন জাফর খান গাজি খামার পাড়ার সহজিয়া বৈক্ষণ
সাধক তিখারীদাস বাবাজির সংস্পর্শে আসেন এবং তার মধ্যে ধর্মভাব দেখা
দেয়। মসজিদের পাশে অবস্থিত ভাঙা মন্দিরে বসে তিনি ঝঁশুরচিন্তা করতেন
ও সময় বিশেষে স্থানীয়দের ধর্মোপদেশ দিতেন। জানা যায়, তিনি নাকি
গঙ্গাভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। গঙ্গাস্তুর রচয়িতা দরাফ খান এবং তিনি অভিন্ন
বলেও শোনা যায়।

যে শাসক হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ বানালেন, তিনিই আবার গঙ্গা পুজারী -
এই বৈচিত্র আমাদের অবাক করতে পারে। জনশুভ্রতি আছে যে তার তৃতীয়
পুত্রের স্ত্রী ছিলেন হুগলীর রাজকন্যা। তিনি ছিলেন হিন্দু ও গঙ্গা ভক্ত। তার
প্রভাবেই জাফর খান নাকি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে
মসজিদটি তৈরি করেছিলেন তার পার্শ্বস্থ মন্দিরটির ভাঙা অংশ থেকে। সেই
মন্দিরে বসেই তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন এ কথা আগে বলা হয়েছে। পরে
১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুদিয়ার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জাফর খাঁ নিহত হন।

মৃত্যুর পরে জাফর খাঁকে ধৰংসপ্রাপ্ত মন্দির প্রাঙ্গনেই কবর দেওয়া হয় এবং
সেটিই জাফর খাঁর পরিবারের কবর ক্ষেত্র হয়ে যায়। তার পরিবারের অন্যান্য
সদস্যের কবরও এখানে রয়েছে। সেই বিস্তারিত বিবরণ অন্য অধ্যায়ে দেওয়া
হবে

বেঁচে থাকতেই তিনি একজন গাজিপীর হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে
মৃত্যুর পর তার সমাধি পরিনত হয় মাজারে। মাজার নির্মিত হয় ১৩১৫
খ্রীষ্টাব্দে।

মসজিদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অলংকরণ:

জাফর খান গাজী মসজিদ ও দরগা (মাজার) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি
জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত। স্থাপনা ছটি বাংলায় বিদ্যমান মুসলিম
নির্দর্শনসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচিত। একটি শিলালিপি অনুযায়ী
মসজিদটি ৬৯৭ হিজরি/১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে।

ভূমি নকশা, জাফর খান গাজী মসজিদ:

আয়তাকার মসজিদটির বাইরের দিকের পরিমাপ $২৩.৩৮\text{মি} \times ১০.৫৩\text{ মি}$ । চুনসুরকির গাঁথনিবিহীন আয়তাকারে কর্তিত পাথর একটির উপর অন্যটির স্থাপনের ঐতিহ্যগত হিন্দুরীতির পরিবর্তে মুসলমানদের প্রবর্তিত ‘ইট ও পাথর’ রীতির এটাই সর্বপ্রাচীন বিদ্যমান নিদর্শন। মসজিদে ব্যবহৃত পাথরগুলি হিন্দু মন্দিরের উপকরণ ছিল। কয়েকটি পাথরে খোদাই করা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি এটি প্রমাণ করে। বহুবার সংস্কারের ফলে এ মসজিদের আসল অবয়ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পূর্বদেয়ালে খিলান পদ্ধতিতে তৈরি পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে। খিলানগুলি মোটা ও ছোট আকারের ষষ্ঠভূজাকৃতির প্রস্তরস্তন্ত্রের উপর স্থাপিত। মসজিদটি বাংলায় মুসলিমদের দ্বারা বিকশিত বহুগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের অনুরূপ। এর ছাদের গম্বুজের সংখ্যা, পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথের সংখ্যার সঙ্গে অন্য একপাশের প্রবেশপথের সংখ্যার গুণফলের সমান। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছুটি করে প্রবেশপথ আছে। ফলে মসজিদটির ছাদে দশটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ প্রস্তরস্তন্ত্র দ্বারা ছুটি লম্বালম্বি পথ (আইল) এবং পাঁচটি ছোট ‘বে’তে বিভক্ত। ফলে দশটি পৃথক খোপ সৃষ্টি হয়েছে। কোণাসমূহে ইটনির্মিত পেন্ডেন্টিভ দ্বারা প্রস্তরস্তন্ত্র ও সুঁচালো খিলানের উপর গম্বুজগুলি স্থাপিত।

সারিবন্ধ সুঁচালো খিলানে কালো রঙের নকশা মসজিদটির অভ্যন্তরভাগকে প্রশস্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। মসজিদের পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে বহুখাঁজ খিলানের মধ্যে পাঁচটি মিহরাব আছে। মিহরাব দেয়ালে প্যানেলের অভ্যন্তরে স্বল্পপরিমাণে নকশা করা হয়েছে। মসজিদের কার্নিস ও প্যারাপেট বাঁকানো নয়। উন্মুক্ত অঙ্গন, রিওয়াক ও মিনারবিহীন শুধু প্রার্থনাকক্ষ সম্মিলিত বাংলার বৈশিষ্ট্যধারী মসজিদ নির্মাণরীতি এ মসজিদে অনুসৃত হয়েছে। এ মসজিদের অভ্যন্তরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এ যে, এর মাঝবরাবর উত্তর-দক্ষিণের ‘বে’তে একটি দেয়াল খিলানের উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত উঠে গেছে। মসজিদের এ অংশগুলিতেই পোড়ামাটির ফলকের অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণের দেয়ালটি ভালভাবে সংরক্ষিত আছে যা প্যানেলে বিন্যস্ত। মাঝের প্যানেলটিকে গোলাপের নকশাকৃত বর্গাকার ফ্রেম দ্বারা উল্লম্বভাবে ছুটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। এর নিচের অংশটি বর্ণাত্য পত্ররাজির সঙ্গে পঁচানো আঙ্গুরলতার নকশায় চিত্রিত এবং উপরের অংশটি ঘনপত্ররাজি ও গুল্মের মধ্যে চূড়াসহ ছুটি অর্ধখিলান মোটিফে নকশাকৃত। পার্শ্ববর্তী প্যানেলগুলিও একইভাবে অলঙ্কৃত। সব প্যানেলই চূড়াসহ বহুখাঁজ খিলানে নকশাকৃত।

উত্তর ‘বে’-এর অলঙ্করণ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবে যেটুকু বিদ্যমান আছে তাতে দক্ষিণ অংশের সাথে পার্থক্য প্রতীয়মান। এ অংশে উল্লম্বভাবে স্থাপিত ছোট ছুটি প্যানেল দেখা যায়, যার প্রতিটি চূড়াসহ বহুখাঁজ খিলানে নকশাকৃত এবং চূড়া থেকে একটি শিকল ঝুলন্ত অবস্থায় চিত্রিত যার শেষভাগে গোলাকার ঘণ্টা

আছে। এ ‘বে’গুলির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এগুলি মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের নকশার সাথে সামঞ্জস্যহীন।

আর শরিরতী ইসলামের খেলাপ হওয়ার কারণে খুব স্বাভাবিক ভাবে কোনো স্পষ্ট ভাস্কর্য দেখা যায় না।

মাজারের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও অলংকরণ:

মাজারটি ছাদবিহীন এবং ছাই কক্ষবিশিষ্ট, যেটি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মি.ডি মণি নামক এক পরিব্রাজক ত্রিবেণী পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে একটি হিন্দু মন্দিরকে গাজীর দরগায় পরিণত করা হয়।

প্রথম কক্ষে চারটি সমাধি আছে, যথাক্রমে - জাফর খাঁ গাজির তৃতীয় পুত্র বরখান গাজি, বরখান গাজির ছেলে রহিম ও করিম খান, এবং একজন অঙ্গাত মহিলার।

দ্বিতীয় কক্ষে চারটি সমাধি আছে, যথাক্রমে - জাফর খাঁ গাজি, তার অপর ছাই পুত্র জয়েন খাঁ গাজি ও করিম খাঁ গাজি, এবং বরখান গাজির হিন্দু স্ত্রী হগলির রাজকন্যার।

সুস্থিতভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় মাজারটির নিচের অংশ অর্থাৎ ভিত হিন্দু মন্দিরের মত। প্রত্যেক দ্বারের উপর খিলানে অর্ধচন্দ্রাকার বহু কারুকার্যখোদিত আছে, তার মধ্যে বহু মূর্তি দেখা যায়। দেওয়ালগুলো বড়

বড় ব্যাসাল্ট ফলকযুক্ত। ব্যাসাল্ট ছাড়াও বেলেপাথরের ব্যবহার দেখা যায়।

পাথর ছাড়া বাকি অংশ সেইসময়কার পাতলা ইঁট দিয়ে তৈরি।

উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দেওয়ালে অলংকরণের হিসেবে সীতা বিবাহ, শ্রী রামের রাবণ বধ, শ্রীরামাভিষিক্ত, সীতা নির্বাসন প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলি অঙ্কিত আছে। মহাভারতে দৃশ্যাবলীর মধ্যে আছে দুঃশাসনের যুদ্ধ, চানুর বধ, কংস বধ প্রভৃতি চিত্র। চেইন ল্যাম্পের মোটিফ মাজারের দেয়ালে বর্তমান। এছাড়া দেয়ালে রয়েছে ঘটের উপর প্রদীপের চিহ্ন এবং পানপাত্রের চিহ্ন, যেগুলি সরাসরিভাবেই পারস্যের অলংকরণের বিষয়। দশাবতার চিত্র রয়েছে। একটি গদাধারী বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়। প্রাচীরে ধ্যান স্থিতি চারটি সাধুর মূর্তি আছে। এগুলো বৌদ্ধমূর্তি। ব্রহ্মবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি ও এখানে দেখা যায়। তার পায়ের পেছন থেকে শেষনাগ উপ্খিত হয়ে ফণা বিস্তার করেছে। এছাড়া রয়েছে পশু প্রতীক। পূর্ব প্রাচীরের দিকে রাস্তার মুখোমুখি কালো পাথরের জাফরি রয়েছে। এবং আরো অন্যদিকেও পোড়ামাটির জাফরি দেখা যায়।

মসজিদ ও মাজার কেন্দ্রিক কিংবদন্তি:

মৌখিক পরম্পরাস্থিত আখ্যানের বিন্যাস থেকেই যেকোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের বা ঐতিহাসিক স্থানের প্রভাব জনমানসে কীরকম তা বোঝা যায়, এক্ষেত্রে সত্য-অসত্য, ঠিক-ভুল, ঐতিহাসিক-কাল্পনিক এই মানদণ্ডগুলি দিয়ে যদি জনশুভ্রতিকে বিচার করা হয় তাহলে তা নিছকই জনশুভ্রতি হয়ে থেকে

যাবে কিন্তু এই জনশুতিসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের আংতর্ভুক্তরণ খেয়াল করলে সেই আংতর্ভুক্তরণের স্বরূপ থেকে কিছু স্বাভাবিক প্রবনতা নির্ণয় করা যেতে পারে, যা বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ধরন বুঝতে খানিক কার্যকরী হবে।

সাধারণত জনশুতির একটি সাধারণ কাঠামো থাকলেও মূলত স্থান, কাল এবং অবশ্যই সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জনশুতির মধ্যে খানিক তারতম্য দেখা যায়, যেমন - জাফর খাঁ গাজির দরগার ক্ষেত্রসমীক্ষায় স্থানীয় মানুষদের দেওয়া সাক্ষাৎকারেই এইধরণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় শিক্ষক তাবরেজ হাবিবি এবং ইতিহাসে স্নাতক মহম্মদ হালিমকে (স্থানীয় বাসিন্দা) এই দরগার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা মূলত দরগার ঐতিহাসিকতার দিকেই বেশি জোর দিয়েছেন অপরদিকে দরগা সংলগ্ন ফুলবিক্রেতা, স্থানীয় ব্যবসায়ী মহম্মদ শাহজাদা, পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে 'ফতিহা' দিয়ে আসা শেখ জেহেল ও তসলিমা বিবি এবং স্থানীয় শিশুদের বয়নে ঐতিহাসিকতাকে অতিক্রম করে স্থান পেয়েছে জনশুতি। এক্ষেত্রে প্রচলিত জনশুতিটির যে সাধারণ রূপ পাওয়া তার স্বরূপে বিচার করলে হয়তো জনমানসে স্থানটির প্রভাব এবং হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ খানিক বোঝা যাবে।

জাফর খাঁ গাজির দরগা স্থানীয়দের কাছে 'পরীর মাজার' নামে অধিক পরিচিত। জনশুতি অনুযায়ী জাফর খাঁ গাজি এবং দেবতাদের মধ্যে একবার শর্ত হয়েছিল যে যদি মোরগ আগে ডাকে তাহলে উক্ত স্থানে মসজিগ হবে এবং

যদি কাক ডাকে তাহলে হবে মন্দির। মন্দির তৈরির ভার ছিল জীন আর মসজিদ তৈরির ভার ছিল পরীদের উপর। এক্ষেত্রে মোরগ ডাকে এবং একরাত্রের মধ্যে তৈরি হওয়াতেই নাকি মসজিদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এছাড়া আরও কিছু জনশৃঙ্খলা আছে, যেমন - মাজার ও মসজিদের মধ্যবর্তী বাগানের এক কোনে একটি ভগ্ন স্তুপ আছে। মসজিদের একটি মিনার ছিল বলে শোনা যায় এবং ভগ্নস্তুপটির একটি মঞ্চের মতো ধরণ দেখে আন্দাজ করা যেতে পারে এটি মিনারেরই ভগ্নাবশেষ। কিন্তু স্থানীয়দের অনেকের মতে এর তলা দিয়ে নাকি একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে যার আবার নাকি ছুটো ভাগ - একটি যায় হংসেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত ও একটি যায় আজমীর শরীফ পর্যন্ত।

এমনও সব গল্প আছে যে, কোনো চোর নাকি একবার মসজিদের পিছনের দেওয়ালে সিঁধি দিয়েছিল। তা সিঁধি মাথা ঢোকানো মাত্রেই নাকি গাজি বাবা টের পান ও তার মাথা কেটে ফেলেন। তা মসজিদের পিছনের দেওয়ালে একটি গর্তকে চোরের মাথার গর্ত হিসাবে নির্দেশ করা হয়।

জনশৃঙ্খলার পরীর আখ্যানটিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে ঐতিহাসিক চরিত্র 'জাফর খাঁ গাজি' এখানে খানিক জ্ঞান হয়ে গিয়ে প্রচলিত পরীর আখ্যানই জনমানসে বেশী প্রভাব ফেলছে অর্থাৎ জীন পরীর মতো লোকপ্রিয় বিষয়গুলোই এক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে এবং শরিয়তী ইসলামের থেকেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এই লোকপ্রিয়তাই মূলত মসজিদের থেকে মাজারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করছে এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রার্থনার স্থান হয়ে উঠছে এই মাজার, যেখানে জনশৃঙ্খলাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

মসজিদ ও মাজার কেন্দ্রিক আচার:

নামাজ বা সালাত হল ইসলাম ধর্মের প্রধান উপাসনাকর্ম। প্রতিষ্ঠিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করাকে শরিয়তী ইসলামে প্রত্যেক মুসলমানের অংশবিশ্বিক কর্তব্য বলে ধরা হয়।

জাফর খাঁ গাজির মসজিদেও এই নিয়ম মেনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নিয়ম প্রচলিত, এক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্মের আলাদা আলাদা সময় প্রচলিত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হল যথাক্রমে - ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, ইষা। এগুলি সময়ক্রম অনুসারে পাঠ করা হয়।

ফজর - উষা থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে পাঠ করা হয়। গ্রীষ্মে ভোর তিনটে থেকে তিনটে পঁয়তাল্লিশ এবং শীতকালে চারটে তিরিশ থেকে পাঁচটার মধ্যে এই নামাজ পাঠ করা হয়।

জোহর - ছপুরবেলা পঠিত নামাজ। সাধারণত ছপুর সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

আসর - ছপুর একটা থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজ পাঠ করা যায়। সাধারণত গ্রীষ্মে বিকাল চারটে থেকে সাড়ে চারটে এবং শীতে ছপুর তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে এই নামাজ পড়া হয়।

মাগরিব - সূর্যাস্তের পর থেকে গোধূলি পর্যন্ত পাঠ করা যায়। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ছটা থেকে ছটা পনেরো এবং শীতকালে বিকাল পাঁচটা থেকে পাঁচটা পাঁচের মধ্যে এই নামাজ পাঠ করা হয়।

ইষা - গোধুলি থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত পাঠ করা যায়। গ্রীষ্মকালে রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা এবং শীতকালে সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এই নামাজ পাঠ করা যায়।

জুম্মাবার বা শুক্ৰবার ইসলাম ধর্মে পবিত্র বার। জুম্মাবারের ফজরের নমাজে বহু মুসলমান একপ্রকার বাধ্যতামূলকভাবে 'জামাত' করেন বা জমায়েত হন। জুম্মাবারে মসজিদের ইমাম 'খুৎবা' পাঠ করেন, ধর্মপোদেশ দেন। বহু সময় বিবিধ রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের কী করা উচিত সেই বিষয়ক আলোচনাও করে থাকেন। জুম্মার ঘোহৰ এর নামাজ জনসংযোগের এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাজারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। মসজিদে সাধারণত স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। জুতো খুলে প্রবেশ করতে হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই মাথা ঢেকে ঢুকতে হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে জিন্স, স্কার্ট প্রভৃতি পোষাক পরে যাওয়া নিষিদ্ধ।

গাজির কবরের উপর চাদর চড়িয়ে বা জাফরিতে সুতো বেঁধে মনস্কামনা জানায়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে তারা মাজারের সামনের ভিখারীদের 'দাওয়াত' দেয় যা, হিন্দুদের কাঙালী ভোজনের অনুরূপ। এছাড়া অনেকে 'ফতেয়া' দিয়ে থাকে। সিন্ধি চড়ায়। মিষ্টি, আতর, ধূপ, মোমবাতি ও ব্যবহৃত হয় উপাসনার উপকরণ হিসাবে। মাজারে গাজিবাবার কবরের দক্ষিণ পূর্ব কোনো একটি পাথর আছে। 'মিন্নত' করার সময়ে বা মনস্কামনা জানানোর সময়ে পাথরটি তুলতে হয়। তুলতে পারলে তা মনস্কামনা পুরণের ইঙ্গিতবাহী। হিন্দু মুসলিম

নির্বিশেষে প্রার্থনা করতে পারে। এই বিষয়টি আমরা দেখেওছি ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে।

উৎসবের বা অনুষ্ঠানের কথা যদি বলতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে সব ইসলাম ধর্মীয় সাধারণ উৎসবই এখানে পালিত হয়ে থাকে। যেমন - ইদ উল ফিতর, ইদ উল আহজা, শবেবরাত, ফতেহা দোয়াজ দাহাম, মহরম। যদিও মহরমের গুরুত্ব এখানে কিছু কম বলে মনে হয়েছে। তার একটা কারণ হতে পারে যে এই মসজিদের পরিম্পত্তি বিশেষে সুন্নী সম্প্রদায় অধ্যুষিত।

মাজারের অধিষ্ঠিত পীর - দরবেশ - ফকিরের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকি কেন্দ্রিক উৎসব 'উরস' নামে পরিচিত। জাফর খাঁ গাজি দরগাতেও ১০ই ফেব্রুয়ারি একটি উরস অনুষ্ঠিত হয়। এটি জাফর খাঁ গাজির জন্মতিথি অনুসারে হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে রাতে 'জুলুস' বা জলসার আয়োজন করা হয়। সাধারণত 'কাওয়ালি' সংগীতের আসর বসানো হয়। স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নামজাদা কাওয়ালী সংগীতশিল্পীরা এখানে অনুষ্ঠান করে গেছেন।

সিদ্ধান্ত:

জাফর খাঁ গাজির দরগা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে আমরা বেশ কিছু ধারণায় আসতে পেরেছি। এই তথ্যগুলি মূলত আমাদের হিন্দু-মুসলমানের যে সমন্বয়বাদী সহাবস্থান তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছে।

প্রথমত দেখতে পাচ্ছি মাজারের সংস্কৃতি অত্যন্ত সেকুলার একটি সংস্কৃতি। কারণ সেখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মনস্কামনা জানাচ্ছে। হিন্দুরাও যেরকম জাফর খাঁ গাজিকে নিজেদের একজন লোকদেবতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। সেরকমই মুসলিমরাও জ্ঞানাতীত আল্লাহরে পাশাপাশি একটি সমান্তরাল দেবপুরুষের ভাবনাকে আন্তীকরণ করেছে। এই আন্তীকরণ অবশ্যই শরিয়ত বিরোধী কারণ ইসলাম আল্লা বাদে আর কাউকে উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে না। আল্লা বাদে আর কারও উপাসনা 'বুত পরস্তি' বা 'কুফেরি' অর্থাৎ অত্যন্ত হারাম এবং বিধর্মীসুলভ আচরণ। হিন্দু - মুসলমান দ্বন্দ্বের একটা বড় কারণ এই আদর্শ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে থাকতে থাকতে এহেন আচার গ্রহণ করছে। ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও আগে যেহেতু হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, সেহেতু ইসলাম ধর্মকে অনেকটা তারা নিজের মতো করে গড়ে তুলল।

এটা সত্য যে উচ্চবর্গীর আসরাফ মুসলমানদের তুলনায় আতরাফ, আরজল শ্রেণীর ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বরং ইসলামীয় সাম্যবাদের বদলে ব্রাঞ্ছন্যবাদী বর্ণাশ্রমই যেন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার অবকাশও বিশেষ ছিল না। ফলে শরিয়তের জ্ঞানই তাদের হয়নি। ফলে শরিয়তী ইসলামকে যে সুফী ইসলাম ভেঙে দিয়েছিল কিছুটা, স্থানীয় মানুষ ইসলামকে আরো বেশি ভেঙে দিল। জ্ঞানাতীতের থেকে প্রায়োগিক ধর্মের রূপ দিল। পূর্ব ধর্মের কোনো কোনো লোকদেবীর পাশাপাশি তারা পীর গাজি দরবেশেরও পুঁজো করতে লাগল।

প্রায়োগিক কারণে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরাও শরণ নিল এই তথাকথিত মুসলমান দেবতার। ফলে এক সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠল। এই সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ালো মাজার।

আমরা তো তাই দেখলাম। সব ধর্মের মানুষকেই আসতে দেখলাম মাজারে নিজের নিজের প্রায়োগিক মনঙ্কামনা নিয়ে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ আচারগত পার্থক্যও দেখা গেল না।

প্রকৃত ইতিহাসের বদলে লোকশুভিগত ইতিহাসই বেশি প্রাধান্য পেতে লাগল। পীর জাফর খাঁ গাজির থেকে লোকমুখে যেন অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে পরি - জ্ঞানের কাহিনী। পরি জ্ঞানের কাহিনী যেন কিছু কিছু সময়ে গাজিবাবাকেও টেকে দিচ্ছে। তবে শিক্ষিত মুসলমানরা অবশ্যই ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেখানে লোকশুভির থেকে সরে আসার একটা প্রবন্ধনা দেখা যায়। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দেখা গেল খুবই কম। ধর্ম বিষয়ে স্থানীয় মানুষের বিশেষ তত্ত্বগত পরিচয় নেই। ইসলাম ধর্ম তাদের কাছে কিছু আচরণ হয়েই রয়ে গিয়েছে। এমনকি মসজিদের ইমামের ছেলেকেও দেখা গেল যে তার জ্ঞানও সাধারণ মানুষের বিশেষ অধিক নয়।

আসলে ইসলাম বাংলায় এসে যেভাবে একটি স্থানিক রূপ নিয়েছে তারই নির্দর্শন এগুলি। শরিয়তী ইসলামের সমান্তরালে গড়ে উঠেছে এক লোকপ্রিয় ইসলামের ধারণা। মাজারের ধারণা অবশ্যই লোকপ্রিয় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি ধারণা। উনবিংশ শতকে 'back to sariyat' আন্দোলনও এই নিম্নবর্গীয় বা সাধারণ বাঙালীর ইসলামের ধারণাকে বিশেষ টলাতে পারেনি।

বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক পরিম্বল হিন্দু-মুসলমানের যে সমন্বয়বাদী
সহাবস্থানের ধারণা তা থেকে পরস্পরের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের সম্পর্ক
তৈরি করছে, কিন্তু আশার কথা এখনও অবধি মাজার তার সমন্বয়বাদী ধারণা
থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই সমন্বয়বাদী লোকপ্রিয় ইসলামের প্রতিনিধিস্বরূপ
জাফর খাঁ গাজির দরগা তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ଆଲୋ-ଖେଳା

ଆକାଶଦୀପ ବେରା



64MP AI QUAD CAMERA
Shot by AKASHDEEP





64MP AI QUAD CAMERA
Shot by AKASHDEEP



১

বন্যা নেমেছিল সেদিন ধূম্রপাহাড় থেকে
মাধবগড়ের সীমানায় লোভ নিয়ে বসেছিল এক বৃন্দ,
এরপর এল সেই দুর্গতিনাশিনী, হাতে উজ্জ্বল গীতি
নাবিক চলল নৌবহর নিয়ে নতুন অতিথি আনতে।

২

রূপনারায়ণের কূলে ছিল সেই শ্বেতপুষ্পের বাস,
আলিঙ্গন পেয়েছিল প্রাণভরে আর কল্পনা ছিল খাসা
ছোট্ট ছোট্ট ছুঁমি ছিল অঘ্রাণের হাওয়ার মতো,
হাতে রংপেনসিল ছিল, ছিল পিণ্ডেরে জড়ানো টিয়া।

৩

বাদল নেমেছিল লজ্জাহীনভাবে
কাঞ্চনজঙ্গলা হাড়াচিল তার বাকশতি,
এটা অভিশাপ বটে যেখানে রেখাচিত্র হানা দেয়
পিড়ন জাগে বাম কোমরে, ভ্রমরের গান শোনা নেই।

৪

আর হবেনা জটিল কাশবনের সাথে মনোমালিন্য,

সে যে সীমাহীন, বাঁধনে থাকতে পারবে কী?

সুর হবে ভাই, নৌকা আবার বইবে বৈকুণ্ঠদিঘীতে,

এবারে ফুটে উঠবে অভিনবত্ব, অচিরাচরিততা।

৫

ভিন্ন পদ তৈরি হবে, কাগজের মেলা বসবে,

একুশ দফা সময় শিক্ষা দেবে আর নিরাসন হবে।

যদি প্রতিদিন ফিরে আসা গানে তোমায় খুঁজি
তুমি বিরক্তির সুরে আলবিদার কথা মনে করাবে ?
স্বরতন্ত্রি ছেঁড়া কান্না...প্রশংস্ত মরুভূমি আর কিছু চেনা শব্দ
তুমি অকারনে ছুঁয়ে যাও দিবারাত্রি।

মনে আছে ফুটফুটে জোৎস্নায় কোপাইয়ের ধারে বসে বলেছিলে-
তোমার জন্মের শেষ নেই...
আমি বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনেছিলাম তোমার করিডোরে।
স্বপ্ন বিভোর চোখ ইশারায় বরে এনেছিল পাহাড় জয়ের সংবাদ!

শহর কফি মগের ধোঁয়ার থেকেও জটিল
আর কোলকাতায় বৃষ্টি হলে আলতো চুমুর অভিমান...
যেটুকু ছিল সবটা নিয়ে গেছে ভাসিয়ে,
তোমার হলুদ খাম ঠিকানাবিহীন।

ট্রামের ভাড়া বাড়ে
তবুও লাইন ছটো সমান্তরাল থাকে আমাদেরই মত।
বিচ্ছেদ আজও...আজও পিলু রাগেই বাঁধা পড়ে!

হঠাতে মন খারাপে বৃষ্টি আৱ মেঘেৱ খোলা চিঠি
আৱ উঠোনে ঝৰা বকুল ফুল, তোৱ নামেৱ ব্যাকুলতা!
ছুটে আসা সব হাওয়াৱা ভীষণৱকম স্বাধীনতা জানে,
তবুও খোলা চিঠি ভেসে যায় শব্দকঞ্চালে...

প্ৰেম বুঝি অসুখ নামক জাহাজড়ুবিৱ গল্প,
শৃঙ্খু জলছবি আঁকে ক্যানভাসেৱ উপৱ!
তোৱ খোলা চুলে বৃষ্টি ঢালে বারোমাসেৱ আমাৱ শ্বাবণ।
চিলেকোঠাৱ ছপুৱ সামনে সুবৰ্ণৱেখা, ল্যাম্পপোস্টে ফড়িং-এৱ সংসাৱ।

জানি বৃথা আত্মাদ,
হুমড়ে মুছড়ে ভাঙে প্ৰেম নঞ্চ কলৱবে।

মৃত্য.....এখনও প্ৰেমিকাৱ ঠোঁটেৱ থেকেও নেশাময়!

তোমায় দেখেছিলাম ভোরের প্রথম আলোয় -

আমার সমস্ত অন্ধকার ধুয়েছিলে চন্দন রঙে।

সমস্ত শরীর ছুঁয়ে ধ্যানে বসেছিল নরম পালকের সারি,

তবুও কুয়াশায় টেকে যাওয়া শহরে রোজ ভেসে আসে কর্মমুখের সাইরেন!

আবার নখের ডগার আমি বিষ মেখেছি,

তোমার স্তনে তার আঁচড়, নিলচে হয়েছে শরীর।

আমি হিংস্রতায় ভালোবাসার মৃত্যু দেখেছি

কিন্তু তোমার চোখে ঘৃণা দেখিনি কেন?

শব্দরা এসে এসে ফিরে গেছে।

আমায় তুমি একটিবার...

শুধু একটিবার ঘৃণা করো।

আমায় তুমি অন্তত একটিবার অপ্রেম শিখিও।

চতুর্থ শ্রেণী,

সোনাগাঁ দক্ষিণতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

আমার ছোটো ঘর পেরিয়ে মন্ত আকাশ দেখি,

উঠোন জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো আমগাছ;

গ্রীষ্মকালে থোকায় থোকায় ফল ধরবে কত

একটু হাওয়া দিলেই মুকুল ঝরছে ছ-চার-পাঁচ।

একপাশে তার ধানের গোলা, পিছনদিকে ক্ষেত,

উঠোনপাশেই পুকুরখানা গাছের ছায়ায় থাকে।

স্নানের ঘাটে দুপুরবেলা একলা বসে দেখি

একটা ছুটো কচি আমকে জল ভাসিয়ে রাখে।

আমি যখন অনেক ছোটো, বিকেলবেলা হলে

গাছের তলায় মাছুর পেতে গল্ল হত কত,

বাঘ-সিংহ-ভুতের সঙ্গে মাছ ধরবার কথা-

দান্ডুর কোলে থাকতো দিদি, ঠিক আমারই মত।

ধানজমির আলটা ধরে, শাকের বাগান থেকে

দেখা যেত নদীবাঁধে চেনা অনেক লোক,

দান্ডুর ঘাড়ে ছোট্ট আমি, দিদির হাতটা ধরে

ঘুরতে যেত দান্ত রোজই, ঝাড় জল যাই হোক।
কালবৈশাখী ঝাড় উঠলেই আম পড়ে টুপটাপ,
যে যেখানে আছে, সবাই এক দৌড়ে আসে।
ধুলোয় ধুলোয় চারদিক সব একাকার হয়ে যায়
দেখছি অনেক আম ঝরছে ওই উঠোনের ঘাসে।
গাছে চড়তে গিয়ে পড়ে গেছি কতবার
দান্ত এসে কোলে করে ঘরে নিয়ে যেতো,
গল্ল কত শোনাতো তখন দান্তর ছোটোবেলার,
দান্তও নাকি দস্য ছিল ঠিক আমার মত।
কতবছর দাঁড়িয়ে আছে দান্তর সেই আমগাছ,
আজ দান্ত নেই, দিদি আর আমি বড় হয়েছি শেষে।
তাও গ্রীষ্মে আম ঝরলেই দৌড়ে দৌড়ে যাই,
আজও দান্ত গল্ল শোনায়, গাছের তলায় বসে।

মনে পরে ঠিক দশটি বছর আগে
বয়স যখন সাত পেরিয়ে আট ,
প্রথম দেখেই দৌড়েছিলিস জোড়ে
যেন পেরতে হবে তেপান্তরের মাঠ।

বন্ধু হতে অনেক সময় লাগে
বিশ্বাস আর ভরসা ছিল মনে,
চেষ্টা আমার সফল হবেই হবে
ফুটবে হাসি ঠোঁটের কোণে কোণে।

এখন গেছে অনেক বছর কেটে
মান-অভিমান, অনেক স্মৃতি জমা,
তোর আর আমার সম্পর্ক যেন
বর্ষাকালের বৃষ্টি বাড়া-কমা ।

এখন মোরা থাকছি হেসে খেলে
পার করেছি অনেকখানি পথ,
নিজেরই এক অঙ্গ তোরে ভাবি
তবুও এখন ‘মা’ -এর আগে ‘সৎ’ ॥

মানুষ আসবে যাবে, থেকে যাবে শহীদের গাঁথা।

সিলিং-এ ঝুলছে যারা, দড়ি এক, মৃত ছটো মাথা!

মরবে ঠিক করেছে। একা গেলে যদি পথ ভুলে

আবারও পৌঁছে যায় সুদখোর এই বর্তুলে

সেই ভয়ে ঝুলে আছে, একসাথে, হাতে হাত রেখে –

মানুষ মরার পর কিভাবে বাঁচতে হয় শেখে।

শিখেও লাভ কি হল! আয়ের চেয়ে বেশি ছিল দেনা!

স্বজন মরার আগে আত্মীয় খোঁজও রাখে না।

যখন খবর পায়, দড়িতে টান পরেছে : জোরে;

মুক্তি পেতেই গলা ধরা দেয় ফাঁসের ভেতরে।

“জলাঞ্জীর টেউয়ে ভেজা বাংলার সবুজ করুণ

ডাঙার”আশেপাশে,

আজও ... মায়াভরা রঙ্গীন গোধুলি –

অপরাহ্নের ধূসর ক্লান্তি মেখে, সন্ধ্যার আবাহনে ফিরে ফিরে আসে।।

অগোছালো ঝোপঝাড় বর্ণময় হয় জোনাকির আলোয়, “সব পাখি ঘরে আসে”

/ “সব নদী” ...

দূর থেকে ভেসে আসে ভাটিয়ালী সুর আলো আঁধারে বন্যেরা ফেরে
বনবাদাড়ে।

মন কেমন করা এসব ছবি

দিনের শেষে আমার দুচোখে স্বপ্ন হয়ে মেশে। তবু, আজও এসবের মাঝে,

কি এক অবুঝ বেদনা বুকে বাজে।

গাছগাছালির ছায়ামাখা অলস অবকাশে

তোমার আঁকা বাংলার মুখ গল্লের মত ভাসে।

মনে হয় বারে বারে,

“হে প্রিয় কবি” – তুমি আজ মরণের পরপারে। ‘একদিন’ কোনো নিঃসঙ্গ,

অতীতে

‘গান্ধুরের জলে’ জীবনতরী খানি ভাসিয়ে

বিস্তৃত করেছ তোমার কাব্যময়পথ,

কাল থেকে কালাতীতে।।

মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না” – তবুও

বাংলার বুকে বারবার ফিরে আসার বাসনায় অনিবার্য মৃত্যুকে বরণ করেছে।।

তোমার চির শাশ্বত আসনখানি বর্ণময় হয়েছে “রূপসী বাংলার” বুকে।

“সাতটি তারার তিমির” মাঝে হয়ত বা

কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবর্তে বনে

তোমার পরলোকের শয্যা রচিত হয়েছে। আজও তাই, জাম-বট-কঠাল আর
হিজলের

তোমায় অনুভব করি প্রাণে মনে

তুমি আছো – পৃথিবীর সবমায়াভরা, কত শত ধানসিডির আশে পাশে –

সবুজ করুণ ডাঙার ঘাসে ঘাসে

বৃষ্টি ভেজা পাখির নিঃশব্দ প্রতীক্ষায়, কিংবা কুয়াশা মাথা ভোরের অপেক্ষায়।

ঝরাপাতার স্তুপের ভিতর,

কোথাও কোনো নিশ্চিত শয়ানে।

কোনো বনলতা, সবিতা, সুদর্শনার স্বপনে।

রোদে জ্বলে সকাল সাঁঝে

আছ আমার জীবন মাঝে

আজও তাই স্মরণে মননে তোমায় অনুভব করি

নানাভাবে নানা কাজে।।

তোমার কাব্যরসের স্নিঞ্চ পরশে ভুলি যত ব্যথা আজকের যান্ত্রিক
নগরসভ্যতাদৃপ্ত সমাজের অঙ্গকারে ডুবে যেতে যেতে –
বিপন্ন মানবতার কশাঘাতে হেরে যেতে যেতে
মনে হয়

একমুঠো রূপালী আশার পথ ধরে বারবার
“ফিরে এস কবি”,
বারে বারে /জন্মজন্মান্তরে – হয়ত মানুষ, নয়ত বা শঙ্খচিল / শালিখের বেশে।
কিংবা ভোরের কাক হয়ে –
ফিরে এস এই পোড়াদেশে, তোমার ‘রূপসী বাংলা’কে ভালবেসে।

(কবি প্রিয় জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থকে সামনে রেখে)

মাঝরাত, নিঃঝূম, এক শুয়ে বিছানায়,
ভেজা চোখ, ভারী মন, স্মৃতি কত গান গায় ,
ক্লিনিলাইট খুব লো, এ যে সেই চেনা মুখ
মনে আসে বারবার ছজনেরই ভুলচুক ।

ছোট ফ্ল্যাট, বেডরুম, এক খাটে দুই জন
দিন শেষে ক্লান্ত কথা হয় ভরে মন
মনে পরে সেই দিন যেই দিন দেখা হয়
চারিপাশে কত হাসি মনে তবু জাগে ভয়।

সেইদিন পাঁচ সাল কত কত উপহার
খুশি মন হাসি মুখ ছোটখাটো সংসার
সাত থেকে সতেরো নিমেষেতে কেটে যায়
কত কথা স্মৃতি সব অ্যালবামে থেকে যায়।

তারপর একদিন বাড়ি ফিরি ফাঁকা ঘর
চিঠি নেই ফোন নেই বয়ে গেছে কোন ঝড়
তারপর ফোন আসে মৃতদেহ দেখে যান

রিলেশন ফাঁকা ঘরে ‘দ্বন্দ্ব সন্তান’ ।।

স্টেশনের মাইক গুলোতে হটাং একটি মহিলার গলায় উচ্চস্বরে শোনা গেলো “রাধিকাপুর এক্সপ্রেস সাড়ে সাতটায় তিন নম্বর প্লাটফর্ম থেকে রওনা হবে”। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইয়াসিন দেখল সাতটা পনেরো বাজে। কলকাতা চিৎপুর রেলস্টেশন এর তিন নম্বর প্লাটফর্ম-এ বসে আছে সে গোফ্ফর-এর অপেক্ষায়। ছইজনই কলকাতায় নতুন এসেছে উচ্চশ্রেণীতে পড়াশোনার জন্য আর এইবারই প্রথম ছুটি পেয়েছে বাড়ি যাওয়ার জন্য, ঈদের ছুটি। তাই ট্রেনেও বিশাল ভিড়, তাই তারা ঠিক করেছে সাড়ে আটটার ট্রেন জগবানী এক্সপ্রেস এ যাবে। কলেজ থেকে ফিরে ইয়াসিন তাই তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছে স্টেশনে।

কিছুক্ষণ ধরেই ইয়াসিন ট্রেনের জানলার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। জানলার ধারে একটা মেয়ে বসে আছে মাথায় কাপড় দিয়ে ইয়াসিন এর দিকে পিছু ফিরে। ইয়াসিন যদিও তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, তাও সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। হটাং ট্রেনের দরজা থেকে “ইয়াসিন” ডাক শুনে তার চমক ভাঙে, “আরে এ তো মারিয়াম এর আবু”। ইয়াসিন বেঁঞ্চ থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসার পর জানতে পারল যে তিনি মারিয়াম কে নিয়ে যেতে এসেছেন, “ও হ্যাঁ মারিয়ামও তো কলকাতায় মেডিক্যাল এর এন্ট্রান্স এর জন্য প্রশিক্ষন নিচ্ছে”। তিনি সেই জানলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন যে সেখানে মারিয়াম বসে আছে। ইয়াসিনের মাথায় যেন

আকাশ ভেঙে পড়ল, তার হৃদস্পন্দন যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো, তার মনে যেন খুশিতে ময়ুর নেচে উঠলো, অন্যদিকে ঠিক সেরকমই ছবি থের নদী বয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

জানলার কাছে গিয়ে ইয়াসিন “ওই” বলে উঠলো। ইয়াসিনকে হটাং জানলার পাশে দেখে মারিয়ামের যে কি অনুভূতি হয়েছিলো তা সে নিজে আর আল্লাহ্ তাওয়ালা ই ভালো জানেন। কিছুক্ষণ দুজনই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপ থেকে একই সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো কে কেমন আছে। ইয়াসিনের হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, হৃদযন্ত্র যেন গাড়ির ইঞ্জিনের মতো দৌড়চ্ছে। মারিয়ামের সাথে যে তার এইভাবে দেখা হবে তা সে ভাবেনি। মারিয়াম যে এখনো তার প্রতি এতো ভালো ব্যবহার করবে, এতো আগ্রহের সাথে অনুভূতি নিয়ে কথা বলবে সেটাও তার কাছে অবাকের বিষয়। কিন্তু ইই বছরের জমানো আবেগের এক শতাংশ(1%)-ও প্রকাশ করার আগে ট্রেন ছাড়তে শুরু করলো। যতক্ষণ ট্রেনের বেগের সাথে তাল মেলানো যায় ততক্ষণ সে জানলার শিক ধরে হাটলো। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ইয়াসিন আর কিছুই বলতে পারলনা। শেষে “ভালো করে যা” বলে ট্রেন ছেড়ে উল্টোদিকে হাটতে লাগল, যেখানে সে বসে ছিলো সেইদিকে। পিছু ফিরে একবারও তাকালোনা। তার চোখের কোণে কী যেন চিকচিক করছিল।

আটটার দিকে গোফ্ফর স্টেশনে পৌছলো। গোফ্ফরের কাছে ইয়াসিন কিছুমাত্র উল্লেখ করলো না পূর্ববর্তী ঘটনার। সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। কলকাতায় কার কি অভিজ্ঞতা হলো এই কদিনে তা নিয়ে কথাবার্তা

বলতে বলতে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো। আর ঠিক সময় ট্রেনও ছেড়ে দিল। জেনারেল কামরায় তারা ইজনই ট্রেনের ভেতরের দিকে ধারে সিট পেয়েছে। ট্রেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরেই তারা ইজনে কানে হেডফোন গুঁজে নিল। ইয়াসিন চলে গেলো তার অতিত রহস্যময় স্মৃতির ছনিয়ায়। চলে গেলো আট বছর আগে ক্লাস সিঞ্চ-এ যেবছর সে প্রথম মারিয়াম কে দেখেছিল। মারিয়াম কে ঠিক কোনদিন, কখন, স্কুলের ঠিক কোথায় সে দেখেছিল তা তার মনে নেই, প্রথম দেখাতে তার কিরকম অনুভূতি ছিলো সেটাও তার মনে নেই। কিন্তু সেই একই বছরে যে মারিয়ামের হাসি, কথা বলার ধরন, চরিত্র গুণ, সবার সাথে মিশুকে প্রকৃতি আর সবার সাথে ভালো ব্যাবহার ইয়াসিনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা তার মনে আছে। তখনকার তার সেই অনুভূতি সে এখনো অনুভব করতে পারে। সে ক্রমে মনে করতে লাগল ক্লাসের ফাঁকে মারিয়ামের দিকে চুপিচুপি দেখার অভিজ্ঞতা, তাকে হাসানোর জন্য নানা রকম কান্দ ঘটিয়ে ক্লাসের মাস্টারের কাছে বোকা খাওয়ার অভিজ্ঞতা, পড়াশোনায় দারুন ভালো মারিয়ামের সাথে সাম্যে আসার জন্য পড়াশুনায় আগ্রহী হয়ে জেদ নিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা আরো স্কুলজীবন ও মারিয়াম সম্বন্ধীয় সমস্ত স্মৃতি সে মনে করতে লাগল।

মাঝে রাস্তায় অনেক বার ট্রেন থামছে আবার চলছে। এখন বর্ধমান স্টেশন এ থেমেছে। হোকারদের চিত্কারে ইয়াসিন এর চিন্তার ভাঙন ঘটল। গোফ্ফরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে গেছে। তাকে ডেকে তুলল, “কি রে কিছু খাবি নাকি? খিদে লাগলে কিছু কিনে নে”, ইয়াসিন ট্রেনে কিছু খায়না।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো আর ইয়াসিন তার চিন্তায় আবার মগ্ন হয়ে গেলো। তার মনে ভেসে উঠলো ক্লাস এইট-এ একদিন সে মারিয়াম এর চোখে নিজের জন্য ঠিক একই অনুভূতি লক্ষ করেছিল। কিন্তু তবুও সে কিছু বলতে পারেনি, সাহস জোটেনি। এই চোখাচোখি করেই ক্লাস এইট, নাইন ও টেন কাটছিল কিন্তু ইয়াসিন আর একটা বিষয় লক্ষ করেছিল যে মারিয়াম এর পড়াশুনা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। যদিও ইয়াসিন তার সাম্য বজায় রেখেছিলো, আর মধ্যামিক এ স্কুলের ফাস্ট হয়েছিল। ইয়াসিনের ধারনা তার এই রহস্যময় অনুভূতির জন্যই মারিয়ামের রেজাল্ট খারাপ হতে শুরু করেছিল। মাধ্যামিক এর সময় তার মারিয়াম কে শেষ দেখার কথা মনে পড়ে, তার পর অনেকে অন্যান্য ভালো ভালো স্কুল-হোস্টেল এ চলে গেলো, মারিয়াম ও কলকাতার এক হোস্টেল এ চলে গেলো। ইয়াসিনেরও যাওয়ার কথা ছিলো কিন্তু স্কুলের প্রতি তার গত ছয় বছরের টান তাকে যেতে দেইনি। এইভাবে সে একই স্কুল এ থেকে গেলো আর মারিয়াম চলে গেলো কলকাতায়।

ট্রেন থামল মালদা স্টেশনে, এখানেই ওদের নামতে হবে। গোফ্ফর-কে ডেকে তুলে ট্রেন থেকে ব্যাগ নিয়ে নামল দুইজনই। এই স্মৃতিচারণ করতে করতে কিভাবে আট ঘন্টার ট্রেনের সফর শেষ হয়ে গেলো ইয়াসিন এর অবাক লাগল, সে একটু নিজের মধ্যেই মুচকি হাসল। ভোর সাড়ে তিনটে বাজে। এখন আবার বাসে যেতে হবে দুই ঘন্টার মতো। ট্রেন স্টেশনে হাত মুখ ধুইয়ে একটা বিস্কুট এর পেকেট শেষ করে তারা বাস স্টেশন এ হেটে পৌছলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এলে উঠে জানলার পাশেই সিট পেল ইয়াসিন আর

গোফ্ফর তার পরে। ইয়াসিন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলো কিন্তু ঘুম এলো না।
সে আবার পুরনো কথা ভাবতে লাগল।

তার মনে এলো সেই দিনের কথা, যেদিন তাদের ছাইজনের (ইয়াসিন ও
মারিয়ামের)-ই বান্ধবী, নূর তাকে মারিয়াম-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়। সেটা
ক্লাস ইলেভেন এ মাঝের দিকে। প্রস্তাব বলা ভুল হবে হয়তো কিন্তু সেটার
মানে তাই বোঝায়, একটা প্রশ্ন, যে সে মারিয়াম কে ভালবাসে কি না। সেদিন
ইয়াসিন বুঝতে পারে মানুষের মস্তিষ্ক কতো দ্রুত কাজ করতে পারে, কতো
দ্রুত ভাবতে পারে। তিরিশ সেকেন্ডে তার মাথায় তিরিশ রকমের চিন্তা
আসে, নানা রকমের যুক্তি-চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনা ঠিক হয়। সে সোজা
সাপটা উত্তরে বলে “না”। হয়তো তার অভিমান হয়েছিল। হয়তো তাকে
পারিবারিক সমস্যা-বামেলার ভবিষ্যত চিন্তা বাধা দিয়েছিল। হয়তো সে
ভেবেছিল এই অনুভুতির জন্যই মারিয়ামের পড়াশুনা খারাপ হচ্ছিল। হয়তো
সে ভেবেছিল এখন "না" বলে, তার পড়াশুনা শেষ হলে সে নিজে থেকেই
প্রস্তাব দেবে। হয়তো বা আরো ছোটো বড়ো নানা কথা ভেবেছিলো। বা
হয়তো কিছু না ভেবেই “না” বলে দিয়েছিল। এইভাবেই আর কি ছই বছর
তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। কোথাও
কখনো মারিয়ামের কথা হলে বা কেউ তার কাছে মারিয়ামের প্রসঙ্গ তুললে
সে সব সময় উপেক্ষা করে চলত।

হটাং ইয়াসিনের ফোন বেজে উঠলো। বাড়ি থেকে দাদা ফোন করেছে
“ভাই কোথায় এখন, কখন পৌছবি বাড়িতে?” জানলা দিয়ে বাইরে দেখে আর

ঘড়ি দেখে ইয়াসিন জবাবে বলল “আর তিরিশ মিনিট দাদা”। ফোন রেখে তার মনে এলো এই কয়েক দিন আগেই নুরের সাথে তার ফোনে কথা হয়েছে। নুরের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে, মারিয়ামের নাকি অন্য এক ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মারিয়াম যে হোস্টেল এ গেছিল সেখানকারই একটি ছেলে। মারিয়াম কে দেখে নাকি ছেলের মা-বার খুব পছন্দ। ইয়াসিন একটা স্বত্ত্বির নিশাস ফেলল। মারিয়াম একটা ভালো পরিবারে বৌ হয়ে যাবে। ছেলেটাও হয়তো ইয়াসিনের থেকে ব্যবহারে অনেক ভালো, মারিয়াম এর ভালো যত্ন নেবে, ইয়াসিনের মতো careless না, মিথ্যেবাদী না, স্বার্থপর না। ডাক্তারি পাস করলেই মারিয়ামের বিয়ে। কে জানে সে তার বিয়েতে নিমন্ত্রণ পাবে কিনা, আর পেলেও সে যাবে কিনা।

সে এখন ভাবল এসব ভেবে তার এখন কি লাভ। সে নিজেকে খুব ভালো বোঝাতে পারে, তার মতো হয়তো এই গুণটা অনেক কম জনেরই থাকে, নিজেকে বোঝানোর মতো। সে নিজেকে বলে “ভাই আমি বিজ্ঞান এর ছাত্র। এইসব অনুভূতি তো সব শুধুই হরমোনাল প্রভাব, অ্যাড্রিনালিন এর প্রভাব। এইসবই তো তাৎক্ষণিক। তার মতো আবার কাউকে পেলে আবার হরমোনাল প্রভাব ঘটবে আবার অনুভূতি জাগবে। তবে এই স্মৃতিগুলো শুধু সঙ্গী হয়ে থাকলে ক্ষতি নেই। অন্তত এরকম দশ ঘন্টার যাত্রায় একটা খুব ভালো সঙ্গী হয়, ফলে বিরক্তি লাগে না। শুধু আর একটা মারিয়াম এর খোজ, ঠিক সেই মারিয়ামের মতো”। ইয়াসিন গোফফর এর গায়ে নাড়া দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিল “কিরে বাড়ি তো, চলে এলাম তো। নাববি, নাকি বাসের সাথেই চলে

যাবি?”, “হম চল”। তারা গাড়ি থেকে নেমে যে যার বাড়ির রাস্তায় চলে
গেলো।



IMRAN ALI

চিত্রকল্প

ইমরান আলী



IMRAN ALI

১.

কখনো কখনো অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে হয়, আবার আমার মত কুঁড়েদের
এক পাতা লিখে নিলেই মনে হয় একটা আলোকবর্ষ লিখে ফেলেছি বাবাদের
মত বিস্তীর্ণ ছায়াপথে। এই যেমন আমার ঘরের বারান্দায় শুকনো পাতা খসে
পরে, সামনে বাগানের পেঁপে গাছটার তেরো বছর বয়স হল, ভাঙা ঘরটায়
সাপ দেখা গেছে পরশু দিন, কালকে বাসস্ট্যান্ডের নির্মলদা'কে ঘোলোটাকা
দিতে হবে--- সাথে সাথেই চলে আসবে সিগারেটের কথা, চায়ের দাম;
শহরের জমায়েতে হঠাত প্রাক্তনীর মুখ ভেসে উঠবে, এগরোলের লাইনে
ঠেলাঠেলি--- ঠিক তখনই নিজেকে আবিষ্কার করি হসপিটালের বেডে ডান
হাতে চ্যানেল গেঁজা অবস্থায়।

ব্যাস, পুরো কেরোসিন অবস্থা!

ঠিক যেভাবে আমরা একবারে নিজেদের জন্য কিংবা অন্যকারোর জন্য সটীক
মানুষ দাগিয়ে দি অনায়াসে, জীবনটাকে মাধ্যমিকের টেস্ট-পেপার ভেবে,
সেই আঙ্গুল গুলোই প্রতিক্রিয়ায় ছুটে আসে গ্র্যাজুয়েশানে ইন্টারনাল হয়ে।
প্রতিটা যাওয়া-আসা, মেট্রো চড়া, অজানা হাতের টানে সিগনাল পেরোনো
এমনকি গাছের গায়ে, নামের পুরোনো খোদাই- সবকিছুকেই কেমন যেন
নিজের থুতনির তিল'টার মত লাগে; ভীষণ নিজস্ব।

আমরা অন্তুদভাবে ছুটি মুক্তক্রমে আবন্ধ- অসীমতা এবং অনিশ্চয়তা। তবু আমরা সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই নিশ্চিত থাকতে চাই; আর এভাবেই আমি, তুমি, তোমার পাশের বাড়ির ভেজা চুলের মেয়েটা কিংবা চিকন চোখের ছেলেটা, পাড়ার নির্মলদা, পরিবার-পরিবেশ আমাদের ক্রমাগত জুগিয়ে যাচ্ছে ভিন্নতা-উন্নতির অন্ধখোঁজ। আর কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে প্রকারধর্মের শাখা ছড়িয়ে পড়ছে প্রশাখা থেকে উপশাখা পর্যন্ত। আর মাটির এই আলগা হয়ে যাওয়াকে আমরা বলে চলেছি কর্পোরেট উর্বরতা...।

২.

"ফিরে আসলে আমাদের দেখা হবে?

আমাদের দেখা হলে কি আমরা ফিরে আসবো?"

প্রস্তরযুগে কোনো এক আদিম মানব-মানবী প্রথম পরস্পরকে কথা দিয়েছিল ফিরে আসার, তারা হয়তো প্রতি যুগে ফিরেও এসেছিল, কেউ পার্শ্বিয়ান হয়ে, কেউ স্পার্টান হয়ে, কিংবা কোনো জন্মে পাশের বাড়ির ছই বন্ধু হয়ে; অত কথা কার মনে থাকে, খেয়াল-ই বা রাখে ক'জন?

আমরা ফিরে আসার কথা দিয়ে চলে যাই, নাকি চলে যাওয়ার জন্যই ফিরে আসার কথা বলা? ভাবলেই কপালের মাঝখানটায় ব্যাথা করে।

সৃতিগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে এই বছর ২৪ বয়সেই। আমার খুব কাছের একজন পায়ের শিরা কেটে ফেলার সুযোগ খুঁজছিল। শুয়ে শুয়ে মশারির ফুটো দিয়ে ঘুরপথে ফ্যানের কাছে পৌঁছতে চাওয়া যুবকের কাছে

এই বন্ধন আত্মবিধবংসী নয় কি? ভিক্ষির ছবি থেকে তার অঙ্গের নকশার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে না তো? অথচ এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ছাদে-বারান্দায়, মা সন্ধ্যে দিচ্ছে নিচের ঘরে, অথচ মা'দেরও তারুণ্য ছিল, যৌবন ছিল। তারা চাইলে কি একটু কঠিন হতে পারতো?

আমার প্রেমিকারা চৌরাস্তার মোড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিজের ঠিক ওপারে, যেন চুলগুলোকে জোর করে মুখের উপর ফেলে বলতে চাইছে, আমি তোমার পনেরো বছর, আমি আঠেরো, আমি তোমার রেললাইন, আমি তোমার টিউশন কামাই, আমি তোমার বিনোদন। প্রেমগুলো কি চরম রকমের ব্যর্থতা!

প্রেমিকাদের চেয়ে দেখলে আমি তাদের ছোট্ট দাবিগুলো বুঝতে পারি। আমার এক প্রেমিকা, বছর সতেরো বয়স আমার, আমার দেরি হয়েছিল বলে আমি না খাওয়া পর্যন্ত খায়নি, কপালে ছোট্ট টিপ পড়া মেয়েটা। ওইটুকু মেয়েটার বন্ধনের প্রতি অটুট বিশ্বাসের কথা ভেবে আশচর্য হই।

কিংবা বিছানায় আদরের চরম মুহূর্তে একটা চুমুর জন্য কপাল এগিয়ে দিত আমার এক প্রেমিকা; তার ওইটুকুই চাওয়া; সম্পর্ক এবং আমার কাছ থেকে। সত্যি! প্রেম গুলো কি চরম ব্যর্থতা!

সবাই একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকান্ত মহীরুহ! তার প্রত্যেকটা শিকড়ে একটা করে বাঁক রয়েছে; চরমতম অবসাদের মধ্যে নুনের মত ভালোবাসা, অবক্ষয়ের একদম শেষ সীমানার স্নেহ জড়িয়ে ফেলেছে আমাদের। আমরা এক একটা গাছমানব। তিনটে খাটের যে কোনো একটা

খাটে উপুড় হয়ে শুরে আছি, খালি গারে, বাইরে কালবৈশাখীতে আমাদের
চুল অবধি কাঁপছে না, শুধু ছেলেমেয়েদের আম কুড়োনোর উল্লাস। ছিঁড়ে
যাওয়া দেখতে বড় রোমাঞ্চ হয়!

প্রাচীন মানুষ গুহায় থাকতে একটা গুহার অসংখ্য পথ কেটে রাখত। কোনোটা
পালানোর, কোনোটা প্রতিরোধের। এখনো মানুষ প্রতিরোধে আরেকটা
শুন্যের জন্ম দেয়।

পিরামিডের মধ্যে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করে, এত মসৃণ পরিবেশ লেখকদের
কাছে নিঃসন্দেহে লোভনীয়, আমিও তো একটা প্রেম, ছটো ডাল-ভাত-
পটলের তরকারি নিয়ে লিখতে পারতাম, কিন্তু লিখছি অবসাদ-অবক্ষয় 'ধ্যান'
মুহূর্ত নিয়ে। পাহাড়ে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়ার মত। আমি কি মেনে নিতে
ভয় পাচ্ছি? আমি কি নির্দিধায় পায়ের শিরা কেটে ফেলতে পারি?

৩.

ঠিক এখান থেকেই আরেকটা পাখনা গজাচ্ছে আমার। উপরের ঘটনাগুলোর
মত আরো কত ঘটনা আমাদের সাক্ষী রেখে আমাদের প্রদক্ষিণ করে চলেছে;
আমরাই টের পাই না, ঠিক যেভাবে বিয়ের সময় সাতপাকের মুখ্যসাক্ষী 'অগ্নি'
টের পায় না। আমার মনে হয় এই প্রতিবন্ধী চরিত্র 'অগ্নি' শুধুমাত্র দু বোতল ঘি
আর এক কুলো খই খাওয়ার লোভে এত অত্যাচার সহ্য করে।

পশ্চিমের একটা উপকথা পড়েছিলাম। উপকথার নাম ছিল 'Hunger of
Fire'। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আগুনের খিদে'। একটু কানে লেগেছিল এই

রকম নাম। আজকে বুঝাই, অনুবাদক বেশ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন বলেই এরকম নাম দিতে পেরেছিলেন। যাই হোক, গল্লটায় আসি, গল্লের মূল ব্যাপারটা হলো, আগেকার দিনে শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোতে বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম প্রয়োজন ছিল আগুনের। বইটি অনুযায়ী, আগুন সেই অঞ্চলের মানুষদের বাঁচিয়ে রাখতো বলে প্রতিদানে আগুনকে প্রতিবছর একটা করে সদ্যজাত সন্তান দেওয়া হত বা অর্পণ করা হত আগুনের খিদে মেটানোর জন্য। তা একবার এক মা তার সন্তানকে দিতে না চাইলে সে আগুনের উপর জল টেলে দেয় এবং আগুন নিভে যায়। আগুন নিভে গেলে ঠাণ্ডায় মানুষ মারা যেতে শুরু করে, এবং সেই মানুষরা আবার আগুনের পুজো শুরু করে। আগুন শর্ত দেয়, তার কাছে যদি সেই মা এবং তার সন্তানকে একসাথে অর্পন করা হয় তবেই সে জ্বলবে। এবং সেইসব মানুষ জীবনের দায়ে, বাঁচার তাগিদে রাজি হয়ে যায় এবং সেই মা এবং তার সদ্যজাত সন্তান আগুনের কাছে খাদ্যরূপে অর্পিত হয়ে যায়।

গল্লটা পড়ে ছোটবেলায় মায়ের ত্যাগটা বেশ মনে ধরেছিল; এখন পড়লে প্রথমেই যেটা মনে হয়, মেয়েদের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে দেখার মানসিকতার জন্ম সভ্যতার শুরু থেকেই।

এভাবেই মানুষ যাদের ই সাহায্যে গাছের ছাল থেকে জিন্সের প্যান্ট অবধি গেছে, যাদের ভয়ে গুহা থেকে ঘরের মধ্যে মেয়েদের খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে রাখার পরম্পরা চালু রেখেছে, তাদেরকেই ভগবান বা পরমপুজ্য বানিয়ে নিয়েছে। রীতি-নিয়ম একই আছে; পাল্টে যাচ্ছে শুধু স্থান-কাল-পাত্র।

মানুষ তার সভ্যতার ইতিহাসে চরম গর্হিত কাজগুলোর সাথে ভয় ঘোগ করে
এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, রঙ—সব একই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন
অবতার।

আপাতত এটুকুই থাক। এরপর লিখলে আমার লেখাটাই হয়তো সেন্সর হয়ে
যাবে; যেটুকু জানাতে-ভাবাতে চাইছি, সেটুকুও আগুনের খিদে হয়ে যাবে।

8.

মেসের একটা ছোট্ট ঘরে পাঁচ ছ'জন ছেলে-মেয়ে বসে আছে। একজন লেখে,
একজন গান গায়, একজন ভালো ক্যামেরার কাজ জানে, একজন ভালো
পরিচালনা করে। তাদের মাঝে বসে আছে একটা জোকার; সে ভালো হাসতে
পারে। খুব হাসতে পারে। মানুষের বিছানায় চাকনার প্লেটে চানাচুরের মধ্যে
একটা পিস্তল রাখা।

সবাই মদ খাচ্ছে, আর জোকার কে দেখে হাসছে।

হঠাৎ জোকার পিস্তলটা নিয়ে ছ'জনকে মেরে দিলো।

কেউ অবাক হলো না, কেউ ভয় পেলো না, শুধু মনের বোতলে পরের রাউন্ডে
ছুটো পেগ কম বানানো হলো। তারপর আস্তে আস্তে সবাই নেশা করে ঘুমিয়ে
পড়ল।

এইরকম একটা দৃশ্যের চিন্তা করলে ঠিক কিরকম লাগে? ভয় হয়? বমি
পায়? নাকি চামরা শুষ্ক হয়ে যায়? এরকম পৃথিবীর মধ্যে আমি বড় হয়েছি।
আমরা সবাই বড় হচ্ছি, বুড়ো হচ্ছি। আখের গাড়িতে নিংড়ে ফেলা আখ

দেখেও আমাদের ফুর্তি হচ্ছে, সেই ফুর্তিতে এক গ্লাস বেশি আর্থের রস খেয়ে ফেলেছি। মৃত্যু, পৃথিবীর বাল অবধি ছিঁড়তে পারেনি। মরা কুকুরের মত হিরোদের মাঝে শুয়ে থেকেছে হ'জন অভিনেতা। হাইরোডের উপর ছবিনের বাসি মৃতদেহের মত।

একদিন যদি এইরকম লাশের হাইরোড তৈরি হয়? দিওয়ালির ছবির মত নাসার উপগ্রহে কি এই ছবি ধরা পড়বে? নাকি তার চোখে গরম আলকাতরা টেলে দেবে বি-জ্ঞানীরা? আমরা যারা রাস্তায় কুড়ি টাকার ডিমপাউরণ্টি আর সঙ্ক্ষেয়বেলা পঞ্চাশ টাকার ধেনো মদ খেয়ে থাকি, তাদের আত্মকথার নাম হতে পারে "হঠাত"।

তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সব ঘটনার আগেই পাইকারি হারে 'হঠাত' লেখা যায়।

আমি বড় হয়েও উড়তে চেয়েছি; দ্বায়িত্ব, স্থিতিশীলতার ধার ধারতে চাইনি কোনোদিন। ভীষণ মনখারাপে ডিঙ্কো নাচতে চেয়েছি, রাগ হলে খিস্তি করতে চেয়েছি, রাস্তায় ভিক্ষে করতে চেয়েছি, রিকশা চালাতে চেয়েছি। কিন্তু 'হঠাত' শব্দটা আমায় তাগিদ দিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে এখানে-ওখানে, পায়েসের বাটি কিংবা স্টেশনের ধারের বেশ্যাখানায়।

৫.

প্রিয় বান্ধবীকে চিঠি,

শরীরে হারমনি হচ্ছে
এখন প্রয়োজন নেই।
সিলিঙ্গার এনে দেবে কে?
পুরে রেখে দেব সাতটা সুরের
ভাঁজ-শুদ্ধু।

কথারা কথামতো চললে মানুষের বয়সকালের অর্ধেক সমস্যার এমনিই
সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কথাদের চরিত্রই রীতি-নীতির ভাঙ্গন ধরানো।

"সমস্ত বিষাদ লুকিরে থাকে যত্নঘেরা অন্ধালয়ে।"

---আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সীমাবদ্ধ কথাপ্রমুখের। কেউ দরজা অবধি
আসতো, কেউ কেউ না বলে বিছানায় উঠে যেত। যারা আহত ছিল, তাদের
আমিই বহন করে আনতাম আমার শক্ত জাজিমের বিছানায়। কেউ আমার
কাছে পথ্যের দাবি করেনি, কেউ কোনোদিন বিছানায় আদর করতে চায়নি
আমায়। শুধু প্রবেশ করেছে আমার শরীরে। শিশু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে
দেখিনি তাদের; পাশে বসে ছুঁয়ে গেছে কপাল আর চিবুক। কথাদের সাথে
রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছি অনেক ছুপুরে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চিতা-
কবর-কফিন তিনদিকে আড়াল করে রেখেছে আমায় সেসব দিনে, আমি
ক্ষুধার্ত হায়নার মত ছিঁড়ে খেয়েছি কথাদের দেহ, সমস্ত রকম বন্যতার
শিকারে বেঁধে ফেলেছি কথাদের। সেসব ছুপুরে শীৎকারের সাক্ষী থেকেছে
জানলার ধারের বৃক্ষ। আদ্যপাত্ত মানুষের মতোই জীবন্ত ছিল সেসব কথা'রা।

কিছু কিছু গাছ আছে তাদের ছাল ছাড়িয়ে নিলে রেজিন পাওয়া যায়। আমার দেহবর্জিত রেজিনের গন্ধ, কথাদের সম্পূর্ণভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়া দেহ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিবার। আমি ক্লান্ত হইনি কোনো ছপুর-রাত্রে। আস্তে আস্তে আমার অত্যাচারে কথারা আসা বন্ধ করে দিলো ছপুরে। আমি উন্মাদ হয়ে গেছিলাম। কথাসঙ্গমের উন্মাদনা কোনো মানব কিংবা অস্পুর দেহের দেহাতীত। ছুঁতে পারছি না কথাদের; শুনতে পাচ্ছি কোনো দুর দিগন্তে সর্বনামের সুরে।

কথোপকথন কথাদের দেশীয় ভাষা। ভীষণ নার্সিসিস্ট রাতগুলোয় বন্ধুরা দরজার কাছে এসে ডাকে। চিকার করে, তাদের স্লোগানের কথাগুলো আমি ভুলতে পারবো না! আমরা কারা? আমরা দেশের বাড়ি যাবো! আমায় ছ'মুঠো বীজ এনে দাও, চানাচুরের মত। বৈঠকখানায় এসে চায়ের সাথে ছবেো ঘাস খাবে তারা। তাদের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে হাতে-পায়ে ব্যাথা করে আমার।

"আমাদের দেশ কোথায়, আমরা কেমন করে গান করবো? তোমার বাথরুম থেকে পাশের বাড়ির ছাদ'টাকে কেমন লাগে নির্বেদ?"

অসংখ্য প্রশ্নে আমার ভয় লাগে। ভাবতে থাকি কি করে এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমরা সজাগভাবে এড়িয়ে যেতে চাই, ঠিক যেভাবে ট্রেনে ভিথিরী এড়িয়ে যাই। কিন্তু ভিথিরিটাও কি সেভাবেই এড়িয়ে যায় পয়সা না দেওয়া বাবুদের? অবশ্য মাত্র একটা টাকার জন্য দুঃখ পাওয়া কখনোই যথাযথ নয়। কিন্তু তাইলেই কি প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়, নাকি চাপা পড়ে যায়? যেভাবে ভালোবাসায় স্ত্রী-পুরুষের যৌনাকর্ষণ চাপা পড়ে যায়!

সেই চাষীর কি হলো, যার আজকে সন্ধ্যাবেলায় শ্যমাসঙ্গীত গাওয়ার কথা
ছিল? সেই আরশোলা দেখে ভয় পাওয়া মেয়েগুলো কোথায়? যারা খুব সুন্দর
রঙটি বানাতে পারতো? তাই'কি আরশোলা প্রজাতি অস্তিত্বসংকটের জেরে
ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে চলেছে!

আমি উত্তর খুঁজে চলেছি। সেই চিন্তায় জামাকাপড় পড়েই শ্বান করে ফেলছি,
স্বাধীনতা দিবস মনে পড়ছে না। সবাই অসুস্থ হয়ে সুস্থ হচ্ছে; আবার অসুস্থ
হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রতিটা ধূলিকণায় নাম লেখা হচ্ছে, সব'টা মানুষের
নামে, একেকজনের নামে এক এক মুঠো ধূলিকণা।

কাদাজলের মালিক নাই? মেয়েরা আর সংসার সাজায় না? চাষীদের লাঙ্গল-
জমি আছে? কুকুরেরা এখন ছপুরে এঁটো কুড়োতে আসে? সাঁওতালেরা সুস্থ
আছে নিশ্চয়; তারা তো মানুষ নয়!

সাঁওতাল, ভীল, জারোয়ারা ভালো থাকুক। সুস্থ থাকুক।

৬.

একটুকরো জান্মালের মত

অপেক্ষা। পুরোটাই অপেক্ষা; গন্তব্যে যাওয়া-আসা, একটা কিন্তুত-কিমাকার
বাসে উঠে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ঘামের গন্ধ, লোকাল ট্রেনে সিটের জন্য
মারামারি, শহরের জনারণ্য, খিলানের গায়ে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস---
পুরোটাই আস্ত অপেক্ষা। এমনকি আসা যাওয়ার মাঝে ছ'দন্ত দাঁড়িয়ে থাকা,

একটা চা-সিগারেট, হোমরা-চোমরা রাজনৈতিক আলোচনা, সবটাই
বিরক্তিকর অপেক্ষায় সমাদৃত।

ভাতঘুম দিয়ে উঠলে বুঝতে পারা যায় না সকাল-সঙ্ক্ষে। তখনও মস্তিষ্কের
স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা। বুঝেই বা কি হবে, ঘুমের তো কোটা শেষ! ঘুম কি
সময় দেখে আসে? হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল,
স্বাভাবিক হয়ে বুঝতে পারলে বাড়ি ফেরার শেষ ট্রেনটা মিস করে গেছো!
স্টেশনের হোটেলে একরাত কাটাতে হবে; শিয়ালদার সব হোটেল দেখলে
ভর্তি। বাড়িতে ফোন করলে না আসার খবর জানানোর জন্য, কেউ ফোন
তুলছে না! ঘুরে ফিরে ছশ্চিন্তা এবং তার সাথে অপেক্ষা,
ছশ্চিন্তা কেটে যাওয়ার।

আমরা কি অপেক্ষা ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না?

রাতে ঘুম না এলে--- অপেক্ষা

ছেলের বাড়ি ফিরতে দেরী হবে--- অপেক্ষা

ব্যাঙ্কে লাইন, ফুচকার দোকানে লাইন--- সেই অপেক্ষা।

বড় নাছোড়বান্দা ব্যাপার!

স্বপ্ন আর সমাজের তাড়া খেয়ে খেয়ে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত। একটু সামলে
উঠলে আবার তাড়া! সমাজ না টাকা ধার দেওয়া মহাজন!!

এর মাঝে একটুকরো গানের লড়াই, সঙ্ক্ষেয়বেলা বউয়ের হাতের চা,
মাঝরাতের আদর, সন্তানের অবাধ্যতা, বাবার ওষুধ। এই দিয়েই বেশ চলে
যাচ্ছে নুনে-ভাতে জীবন। কিন্তু শেষমেষ বড় কথাটা হচ্ছে, এত কিছুর পরে

বালিশে মাথা রাখলে কতক্ষণের মধ্যে ঘুম পায়, সেখানেও সেই ভেড়া গোনা
'অপেক্ষা'।

শ্টেট-শ্যাঠাং

কবিতারা হেঁটে যাচ্ছে
---দিল্লি থেকে কলকাতা
কবিতারা ছুটছে উর্ধস্বাসে, অবিশ্রান্ত
আমরা ছুটতে ছুটতে পড়ছি, লিখছি
চোখে-নাকে-কানে ব্যাথা করছে---
পেটের ভেতর গুলিয়ে যাচ্ছে অন্ত্র, উর্বর
জমি, নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়।

চশমা পড়লে সবাইকে কেমন ভিরিঙ্গী দেখায়। সবাই বলে বই পড়তে পড়তে
চশমা হয়ে গেছে। কাট্টুন বা ভূতের ছবি দেখতে গিয়ে কারোর চোখ খারাপ
হয়না। আমরা যে যার মত কারণ বানিয়ে নিয়েছি অসুখের, যে সব অসুখের
কারণ বানাতে পারিনি তাদের সবাইকে নিয়ে ফর্দ বানিয়েছি---- লিখে
দিয়েছি, 'নট অ্যান আইডিয়াল ডিসিজ'।

আমার রোগ আছে। মিষ্টি খাওয়ার, প্রত্যেক কেজো বাঙালির মতোই আছে
সমালোচনার অসুখ। কে মন্ত্রী হলে দেশ ডানদিকে চলবে, কে ব্যাট করলে

প্রতিবেশী জেঠুকে আরো হটো বেশি খিস্তি করা যাবে, সব নিয়ে সমালোচনার একটা এনসাইক্লোপিডিয়া। কুকুরদের ডাকের সূক্ষ্মতা থেকে খাতুন বৌদির বুকের মাপের তীক্ষ্ণতা, সবটুকুর দায় আমাদের, সমাজের।

একটা সময় ছিল, ছাদে ছাদে মা'দের গল্ল করতে দেখেছি। আম-ডালের রান্না, এবং সেটাকে কিভাবে আলমারিতে বেশিদিন রাখা যায়, মুখ্স্ত ছিল আমার। কিন্তু এইসবের কোনো ছবিই আমায় বিছানায় উত্ত্যক্ত করতো না, উত্ত্যক্ত হতাম চশমার জেরো। চশমা এবং চশমা পড়া লোকজন--- রীতিমত বিভীষিকার মত আমার বিছানা ভিজিয়ে দিত।

৭.

আমি একটা হজুগবাচ্চা। যদিও এইরকম কোনো শব্দ নেই অভিধানে, তবু আমি হজুকবাচ্চা। মনখারাপের মেজাজটাই যেন আমার প্রিয়।

জীবনে প্রথম কবিতাজাতীয় একটুকরো লিখেছিলাম প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে। সেইসব রূপোলি দিনের মত--- সাদামাটা ভদ্রলোক গোছের লেখা, নিজের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যকারোর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই, আবার নিজের ক্ষেত্রে কাছেও ভয়ে গুটিসুটি। পেন্ডুলামের দোলকের মত জীবন, কোনো কিনারা নেই, থামতে হলে মাঝরাস্তায় থামতে হবে। অফিস আর বাড়ি লোফালুফি খেলছে আমায় নিয়ে। অফিস যাচ্ছি ছাতা নিয়ে, আসার সময় ছাতা ভুলে গিয়ে ফেরত আনছি ছ'শো ভেন্ডি, ছ'শো গাজর, আর একটা কুমড়ো।

কোনো এক মহাপুরুষ বলে গেছে, "জীবনযুদ্ধ প্রফুল্লময়"। আমি হলফ্ করে বলতে পারি মধ্যবিত্ত জীবন হল্লোড়ময়, কিংবা মল্লযুদ্ধময়। চশ্চল ছিঁড়ে যাক, কি হৃদযন্ত্রের সমস্যা--- অফিস কামাই করা যাবে না। এই বিষয়ে একটা মজার ঘটনা শুনেছিলাম, তবে সত্যতা সম্পর্কে আমি কোনো দাবি রাখছি না।
আমার এক রসিক গুরুজনের কাছে শুনেছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যখন জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি শহরে বোমা ফেলে, এক জাপানী হিরোশিমায় বিস্ফোরণে বেঁচে গিয়ে পরদিন সকাল ন'টার ট্রেন ধরে নাগাসাকি যায় অফিস করতো। সেখানেও বিস্ফোরণ হলে পাতালঘরে ঢুকে দ্বিতীয়বারেও রক্ষা পায়। এই রহস্যজনক রম্যময় গল্লে যে ভদ্রলোকের উল্লেখ আছে, তাকে সৌভাগ্যবান বলার থেকে 'মধ্যবিত্ত বিড়াল' বলা আমি বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

মধ্যবিত্ত নিজের নিজের জীবন-রিঞ্চা চালাচ্ছে পাছা বদলে বদলে। পায়ের পাতা প্যাডেল অবধি না পৌঁছালেও, কই বাত নেহি!
খুব সচ্ছল, সুখী পরিবেশে হঠাৎ ছুঁথ কেন পাবো! এই যেমন বেঁচে বর্তে আছি, বাবার টাকায় শনিবার উপোষ করে রবিবার মাংসভাত খাচ্ছি, ছপুরে ঘুমোতে পারছি। ফ্যান চলছে, টিভিতে সিরিয়াল হচ্ছে--- সেসব দেখে উত্তেজিত হয়ে কেঁদে ফেলছি। কিন্ত কোনোটাই মানানসই লাগছে না, ঘুমোতে ঘুমোতে জাগতে চাইছি, জন্মদিনে কেঁদে ফেলছি; সবটা কেমন

শবাসন করার মত সোজা। মানে, যেমন খাটিয়া পেতে শুলেই স্বপ্নে
গোয়ালঘর দেখার মত।

এইজন্যে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাইছি, কিংবা মৃত্যু। নিজের
মৃতদেহ নিজেই সৎকার করবো একদিন, প্রথমে অর্ধেক পুড়িয়ে সেই
আধপোড়া দেহ পুঁতে দেব। ফলকে লেখা থাকবে "মাধবীলতা--- সাজানো,
অসহিষ্ণু মৃত্যু হইতে সাবধান।"

আমায় নিয়ে গল্ল হবে, সিনেমা হবে, নিদেনপক্ষে কেউ একজন বক্তৃতা দেবে
পাঁচ মিনিট। তারপরে আমার এখান থেকে ছুটি। তখন পাহাড়ে যাবো,
এভারেস্ট ছাপিয়ে চীনের পাহাড়ে, তির্বতি সাধুদের আখড়ায়, হালফেতি
শহরে কালো গোলাপ হয়ে চিঠি লিখব কোনো সন্তানহারা মাকে, স্বামীহারা
পত্নীকে।

আমার পাখা গজাবে, লেজ বেরোবে। উড়ে উড়ে আকাশগঙ্গা বেয়ে অন্য
কোনো সমান্তরাল জগতে চলে যাবো। হঠাৎ একদিন ডানায় আওয়াজ করে
পরে যাবো নদীর ধারে, গভীর জঙ্গলের কোনো গাছের ডগায়।

শুধু, শুধু পড়ন্ত বিকেল। অজুহাতের মসজিদে দামাঙ্কাসের প্রফেট আমার
নামে মন্ত্র পড়বে,

"হোলি মাদার রেস ইউ!"

৮.

"আমি গোটা কবিতায় পাছা উঁচিয়ে রেখেছি,

কিন্তু শেষ হুটো লাইন দূর্বান্ত।"

এত যে কিশোর, এত যে যুবক--- তাদের চওড়া কাঁধ, আর্য্য-গড়ন, নড়িক জলদস্যদের মত বুক। পুরুষসিংহদের মাঝে ছোট্ট ইঁছর কিংবা খরগোশের মতও একটা প্রজাতি বসবাস করে থাকে। সমান্তরাল ভাবে তারাও কৈশোর, ঘৌবনের সেতু অতিক্রম করছে। কিন্তু তাদের ছোটা দেখে কচ্ছপ হেসে দেবে, ষাঁড়েও মুখ দেবে না। কিন্তু তারা আছে। ছিল-আছে-থাকবে।

আমরা যতই অস্বীকার করি--- বন্ধুত্ব, মেলামেশা, স্কুলে পাশে বসা; এরা না থাকলে প্রথম সারি বলে কিছু থাকতো না। যেভাবে মুঢ়ি আছে বলে ফর্সা পায়ে উঞ্চি আঁকা যায়, আফ্রিকা ছিল বলে কুমির শিকার করা যেত।

যুম থেকে উঠে, আমরা হেঁচট খাওয়া কলুর বলদ। দিনের বেলা গান্ধারী হয়ে চোখে একফালি কাপড় জড়িয়ে রাখি, রাত্রি বেলা সেই ঘামে আমাদের লোমে সুড়সুড়ি হয়। যে ঘার কোটুর থেকে বেরিয়ে আসি দোকানে-বাজারে, মদের আড়ডায়, সিনেমা-শরীর খেলায়। সকাল অবধি খুশি-খুশি, খুশি একশোবার। আমরা টাকা পাই আলো আলোয়, কিন্তু আমাদের রঞ্জি-রঞ্চি আজও অন্ধ, লোডশেডিং-এ;

ধর্মভীরুৎ পঁ্যাচা, চোখ গোলগোল পঁ্যাচা।

৯.

ধরে নাও, কাঞ্চনজঙ্ঘার উরুর কাছে তোমার একটা ছবি উঠলো, নীল সোয়েটার পড়ে বাদাম খাচ্ছে। তুমি একবারের জন্যেও কি ছবিটা দেখতে

চাইবে না? তাহলে একটা চুম্বনের দাবি করতে লজ্জা পাই কেন? বলবে, যাঃ, ছবি তোলার লোকটা তো অচেনা হতেও পারে। কিন্তু, ভাবতে হবে ছবি তোলার জন্য পছন্দ-অপছন্দ থাকে, তোমাকে তার পছন্দ হয়েছে বলেই না বাদাম খাওয়ার সময় তোমার গাল, কপাল, ঠোঁটের চলনরেখা তার কাছে ধরা দিয়েছে; সেইরকমই কারোকে তোমার পছন্দ হলে তার কাছে একটা চুমুর কথা বলতে লজ্জা পাও কেন?

এখন বলবে আমি বাজে বকছি, কিংবা নেশা হয়ে গেছে আমার। আমরা সবাই তো নেশার টানেই আছি, ঘুরতে যাচ্ছি, কাজ করছি, ফ্ল্যাটে শরীর নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি, পুরোটাই তো ভালোবাসা, নেশার ঘোরে খুঁজে চলা। পছন্দকে ভয় পেয়ে, আঙ্গুল কামড়ে, দাঁতে-ঠোঁটে জড়িয়ে জড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছি সাতসমুদ্র, হিমালয়, তিব্বতি উমরণ--- কাছে আসতে হলে অজুহাত লাগে কেন, এমনি অকারণে কাছে আসলে কি তোমার কপাল চওড়া হয়ে যাবে? তাহলে, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে মন চায় কেন? পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় কেন?

পাশের মানুষটার হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে শরীরের তীব্র শিরশিরানি অনুভব--- হাত টা চেপে ধরার বদলে ছেড়ে দাও কেন? ভালোবাসা, তুমি তো অশীতিপুর, চঞ্চল, চিরযুবক। তবে ভয় কিসের, সঙ্কেচ কিসের? কাছে এসো, পাশে বসে জড়িয়ে নাও শীতের কাঁথা--- উষ্ণতাই তো প্রমান, আমরা বেঁচে-বর্তে আছি। আমরা কথা বলছি, গান বাঁধছি, আদিমকাল থেকে পরস্পরকে বলে আসছি--- হ্যাঁ, ভালোবাসি। সভ্যতা কোনোদিন 'আদিমতা'কে আমল দেয়নি, অস্বীকার করে এসেছে সেইসব দিনের কথা, কত-শত যুগের কথা।

আদিমতার প্রসঙ্গ উঠলে আমরা ছোঁয়াচে রংগীর মত ব্যবহার করি, আমাদেরই
তৈরি পিরামিডের গঠন প্রত্যেক আধুনিকা'কে শুলের ওপর বসিয়ে দিয়েছে।
পড়ে যাওয়ার থেকেও বেশি বসে থাকার ভয়। অথচ, আমরা ভুলে গেছি,
নড়বড়ে ভিত্তুক্ত বাড়ি তৈরি অসম্ভব। আমাদের জন্ম থেকে আমাদের
অপত্যের জন্ম পর্যন্ত আমরা আদিমতার একনিষ্ঠ উপাসনা করে যাচ্ছি।
আদিমতার প্রতি শহুরে অবহেলা, অবস্থা--- রূপোলি মেঘের মত অবচেতনে,
প্রলয়কে উপাস্য মেনে নেওয়া। নিজেদের মধ্যেই যে আদিমতার অনন্ত
রহস্য লুকিয়ে আছে, তা আমরা এখনো উন্মোচন করে উঠতে পারিনি। আর
এই আত্ম-উন্মোচনের ব্যর্থতার কারণেই হয়তো আধুনিকতার তাগিদে,
অনাবিন্ধুত অন্তর্বর্তী আদিমতাকে আমরা জুজু'র মত ভয় পাই।



© DEBANJAN GHOSH



© DEBANJAN GHOSH

চিত্রকলা

দেবাঞ্জন ঘোষ



We may not redeem the lives lost, but we will always bear them in our heart.

চিৎকর্ণ

কৃপকল্প ভট্টাচার্য

Class 3

Birla High School, Mukundapur

<https://drive.google.com/file/d/1-9LhuH8MpLHo-OAvw5FOChGZGul9ill2/view?usp=drivesdk>





থ্রৱন্তোতা (Audio-Visual). --- দেবার্ঘ্য, জৈমিতি

<https://youtu.be/MI-IYSQ-NsE>



Meet the editors:

Aritra Dutta



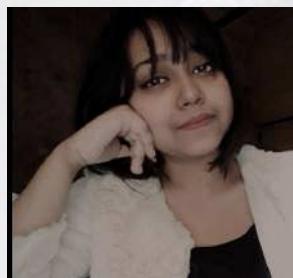
Debarghya Chakraborty



Ipsita Sardar



Atreyee Halder



Sohan Ghosh



sayak chakraborty



Rajarshi Chakraborty

